হেমন্তের বর্ণমালা

হেমন্তের বর্ণমালা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্র কা শ ন

৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক : অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০

উপদেষ্টা :
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ : গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : বিজন কর্মকার

মুদ্রক : অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

শ্রী তপেশ বসু
প্রীতিভাজনেষু

নদীর ধারে লোকটা ওপারের কাউকে ডাকছিল, বসন্তো ! বসন্তোও ! বসন্তোও-ও ! ডাকতে ডাকতে চিড় খেয়ে যাচ্ছিল তার কণ্ঠস্বর। শরতকালে নদীর জল কানায়-কানায় ভরা। স্রোত বইছিল কী বইছিল না। গাঢ় গম্ভীর সেই ভরাট জলের ওপর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, বসন্তো ! বসন্তো-ও ! বসন্তো-ও-ও !

ভাটু মিস্ত্রি বলল, অই লাও ! বসোবাবুর আবার শুরু হল ! দিনকতক বেশ থাকবে ; থাকতে-থাকতে হঠাৎ এইরকম—বলে আমার হাত ধরে টানল। সরে আসুন এখেন থেকে। লতুন মানুষ দেখলেই গালমন্দ করবে।

ভাটু মিস্ত্রি আমাকে টানতে টানতে নিচু বাঁধটার ওপর নিয়ে গেল। তার ওধারে পিচেমোড়া জাতীয় সড়ক। অবেলায় একঝাঁক ট্রাক চাপা গজরাতে গজরাতে কলকাতা যাচ্ছে। বাজারের দিকটায় থিকথিকে ভিড় এখনও। আজ হাটবার ছিল। পেছনের চটানে পুকুরপাড়ে বটতলায় একদঙ্গল গরুমোষের গাড়ি। সেখানে ধোঁয়া উঠছে। গাড়োয়ানদের এতক্ষণে রাঁধাবাড়া শুরু।

বসন্তো ! বসন্তো-ও ! বসন্তো ও-ও ! ডাকটা মাথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল। ঘুরে দেখলাম, লোকটা এবার তিড়িংবিড়িং লম্ফঝম্ফ জুড়েছে। বিকেলের নরম গোলাপি রোদ্দুরে একটা ছায়ামূর্তি ভূতের মতো নাচানাচি করছে নির্জন নদীর ধারে। ভাটু তাই দেখে খিকখিক করে হাসতে লাগল।

জিগ্যেস করলাম, লোকটা কে ?

ওই তো বললাম, বসোবাবু। ভাটু বলল। সময়ে ভাল, আবার সময়ে খারাপ।

কিন্তু কাকে ডাকছে বসোবাবু ?

ভাটু অবাক হবার ভঙ্গিতে বলল, বুঝলেন না ? নিজেই নিজের নাম ধরে ডাকছে ! আর ওই যে দেখছেন লম্ফঝম্ফ করছে—শাসাচ্ছে। মুখে যা নয় তাই বলে খিস্তি। শুনলে কানে আঙুল গুঁজতে হবে। চলে আসুন !

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। বললাম, তাই বলো ! পাগল !

মাঝে মাঝে। ভাঁটু হাঁটতে হাঁটতে বলল। মাঝে মাঝে। বেশ ভাল থাকে, আবার হঠাৎ—মেয়েটার বড্ড কষ্ট। এতক্ষণ বেরিয়ে পড়েছে বোধ করি। দেখা হলে বলে দিতাম।

অনেক লোক আছে, যারা নিজের জানা জগতে পা রেখে কথা বলে এবং ধরেই নেয়, যাকে বলছে সেও তার সেই জানা জগতের বাসিন্দা। ভাঁটু মিস্ত্রিও সেই লোক। সে বকবক করতে করতে ঢালু আগাছা ঢাকা জমিটা পেরুচ্ছিল। পেছনে আমি। ভাবছিলাম, সত্যিই বেশ অদ্ভুত জায়গা এই ঝাঁপুইতলা। এখানে নদীর ধারে গিয়ে কেউ চেঁচিয়ে ওপারের কাউকে ডাকার মতো করে নিজেকেই ডাকে। কেউ রাতদুপুরে মাথায় জ্বলন্ত ধূপচি নিয়ে ধূপ ছড়িয়ে আগুনের ঝলক তুলতে তুলতে পোড়ো মন্দিরে একটা কিছু করতে যায়। ভাঁটু বলেছিল, তাহলে যুগির বউকেই দেখেছেন। ও মাগি এক ডাকনি। মানে, ওর কাছে কামিখ্যের এক ডাকনি আছে। চোখদুটো দেখলেই ঠাওর হবে সেটা।

ভাঁটু বলেছিল, তবে বরমবাবুকে দেখলে আপনার মনে হত, একটা জিনিস দেখলাম বটে। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি তাকে। খড়মপায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। বেশ হাঁটছেন। হাঁটছেন—তা পরে হঠাৎ দেখলেন কী, খড়ম হাঁটছে, মানুষটা নেই। আপনি থমকে গেছেন। ভাবছেন, সব্বোনাশ! সব্বোনাশ! এটা কী হল! তখন হঠাৎ বরমবাবু দেখা দিয়ে মুচকি হেসে বললেন, ভয় পেয়েছিলি ব্যাটা? সাধক পুরুষ মাস্টামশাই! মাথায় জটা, পরনে লাল কাপড়, গলায় বাঘনখার মালা, হাতে তিরশুল—পেকাণ্ড!

ভাঁটু বলেছিল, আর ছিল এক ফকির। এখনকার গাজাখোঁরটা নয়। সে ছিল সাধকপুরুষ। খোঁড়া পীরের দরগায় থাকত। রাঁধতে বসেছে, তো লকড়ি নেইকো। দিলে একখানা ঠ্যাং উনুনে ভরে। জ্বলতে লাগল। বুঝলেন তো মাস্টামশাই!

বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের দরজা-জানালা তৈরি করতে করতে ভাঁটু মিস্ত্রি এইসব অদ্ভুত গল্প বলেছিল। ওর মুখ দেখে বোঝা যায় না, এই পেটেন্ট গল্পগুলো নিজেও বিশ্বাস করে কিনা। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। বেঁটে চ্যাপ্টা গড়ন। বুকে প্রচুর কাঁচাপাকা লোম। প্রচণ্ড গোঁফ। তুরপুন ঘুরিয়ে কাঠে ফুটো করার সময় বাহুর মাংস থলথল করে। যৌবনে লোকটির স্বাস্থ্য কী ছিল আঁচ করা যায়।

হংসধ্বজ বলেছিলেন, আমাদের ঝাঁপুইতলা এখনও বড্ড প্রিমিটিভ। তুমি হাইওয়ে দেখছ। হাটতলায় একটা বাজার বসেছে দেখতে পাচ্ছ। বিদ্যুৎ দেখছ।

লোকজনের পোশাক-আশাকে শহরের ছাপ দেখছ। কিন্তু আলোর তলায় অন্ধকারের মতো ঝাঁপুইতলায় এখনও আদিমযুগ চলছে। সারাজীবন ধরে লড়ে শুধু একটা প্রাইমারি স্কুল দাঁড় করাতে পেরেছি। গত দশবছর চেষ্টা করেও হাইস্কুল করতে পারা গেল না। শেষে এই বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। দেখা যাক, অন্তত যদি বুড়ো গাধাগুলোকে পিটিয়ে ঘোড়া করা যায়। কী? কেমন বুঝছ? পারা যাবে না?

বলতে হয়েছিল, কেন যাবে না? বেশ উৎসাহও তো লক্ষ্য করছি এদের মধ্যে।

হংসধ্বজ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, উৎসাহ? এই যে সন্ধ্যার পর সব দল বেঁধে আসে তোমার কাছে অ আ ক খ শিখতে। কেন আসে জানো? এক কাপ চা খেতে। চা যদি প্রথমেই দেওয়া হয়, দেখবে সব হাই তুলে ঢুলছে। তারপর দেখবে, একে-একে কখন অন্ধকারে পুড়ুৎ করে পিঠটান দিয়েছে। শুধু দেখবে ওই ব্যাটাচ্ছেলে ভাঁটু—ভাঁটু একা বসে আছে। কেন জানো? দরজা-জানালা ওকে দিয়েই করানো হচ্ছে—পাছে ওকে বাদ দিয়ে আর কোনো মিস্ত্রি আনানো হয়! ভাঁটু মহাধূর্ত।

ভাঁটুকে আমার কিন্তু ধূর্ত বলে মনে হয় না। লোকটা একটু বেশি কথা বলে এবং ওর সব কথা হয়তো আমি বুঝতেও পারি না। কিন্তু লোকটা অকপট এবং রসিক। সহজে হাসতে জানে। এই যে আমাকে নিয়ে প্রতি বিকেলে এক চক্কর করে ঘুরতে বেরোয়, নানা জিনিস গাইডের মতো চিনিয়ে দেয়, ব্যাখ্যা করে, তারপর হাটতলার কাছে পিচরাস্তার ধারে বাজারে ঢুকে চায়ের ফরমাস দেয় এবং কিছুতেই আমাকে দাম দিতে দেয় না, এসবের মধ্যে তার আন্তরিকতা গাঢ় বলেই মনে হয়। তাছাড়া তার মেধার পরিচয়ও পেয়েছি। কয়েকটি দিনের মধ্যে সে নিজের নাম লিখতে শিখে গেছে, যদিও শ্লেটের ওপর তার হাত যতটা খুলছে, কাগজকলমে ততটা নয়।

হাইওয়ের দুধারে বাজারটা ছোট্ট। তবু বাজার। পেছনের পুরনো হাটতলায় সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। এই দুটো দিন সন্ধ্যার পরও বাজারে ভিড় গমগম করে। অন্যান্য দিন ভিড়টা কম। আশেপাশের গ্রাম থেকে বিশেষ করে যুবকরা দলবেঁধে আড্ডা দিতে আসে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পর প্রকাণ্ড পুকুর। তার উল্টোপাড়ে ভাটিখানা। সেখান থেকে চাপা হল্লার শব্দ শোনা যায়। সাঁওতাল বস্তি থেকে মেয়ে-মরদের দলটা ঢোল বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে ভাটিখানার দিকে যায়, যেন এক মিছিল। ফেরার সময় সবাই তালকানা। রাত একটু বাড়লে

বাজারের 'দেশী মদ ও গাঁজার' দোকানের সামনে জড়ানো গলায় কোনো একলা মাতাল বিরহের গান গাইবার চেষ্টা করে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের ঘরটা থেকে পরিষ্কার শোনা যায়। তখনও শোনা যায় দূরের সাঁওতাল বস্তিতে ফিরে যাওয়া দলটার বেতাল ঢোলের বাজনা।

চাওলা লোকটির গলায় তুলসীকাঠের মালা এবং মাথায় টিকি আছে। দোকানের সামনে বাঁশবাতার বেঞ্চ। দেখলেই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, জয় নিতাই, জয় নিতাই, বসুন মাস্টারমশাই! বসুন।

ভাঁটু মিস্ত্রি বলল, বসোবাবু আবার বিগড়েছে, বুঝলে জগন্নাথ? নদীর ধারে দেখে এলাম।

চাওলা জগন্নাথ শুধু বলল, ও।

বেঞ্চের একধারে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ মুসলমান। মাথায় টুপি, পরনে আলখেল্লার মতো সাদা পাঞ্জাবি আব নীল লুঙ্গি। বললেন, মিস্ত্রিমশাই, বসোবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েছে, নাকি হয়নি?

মিস্ত্রিমশাই শুনে হাসি পেল, ভাঁটু কীভাবে নেবে। ভাঁটু ফিক করে হেসে বলল, ক্যানে বল দিকিনি হাজিসায়েব? কলমা পড়াবে নাকি?

হাজিসায়েব দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তৌবা তৌবা! কথা শুনেছ হারামজাদার? ভাল মনে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তো খালি শয়তানি।

মিস্ত্রিমশাই হারামজাদা হয়ে গেল দেখে চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু ভাঁটু গ্রাহ্যই করল না। একই সুরে বলল, যেমন বসোবাবু, তেমনি তার মেয়ে। বরঞ্চ বাপের চেয়ে এককাঠি সরেস। সেদিন দুপুরবেলা দেখি, হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম যদি, ও চিমনি, কোথায় চললে গো? চোখ কটমটিয়ে বলে কী, মরতে। আম্মো বাবা কম নইকো। চল তো দেখি, কোথায় কী করে মরবি, দেখব।

হাজিসায়েব হাঁ করে শুনছিলেন। বললেন, গেলে তুমি পেছন-পেছন?

গেলাম বৈকি।

তা'পরে?

শেষবেলার বাসটা শহর থেকে এসে থামলে হুড়মুড় করে একদল লোক নামতে থাকল। বাসের মাথাভর্তি লোক। পেছনেও ঝুলছিল। এবার মাটিতে পা রেখে প্যারেড শুরু করল। হাজিসায়েবকে দেখলুম, প্রকাণ্ড শরীরটা কীভাবে টর্পেডোর মতো ছুঁড়ে দিলেন বাসের ভেতর। ভাঁটু দাঁড়াল।... চলুন মাস্টামশাই! আর বসে জুত হবে না। জগনকে ছিঁড়ে খাবে এখন।

গ্রামের রাস্তায় ঢুকে সে চোখে ঝিলিক তুলল হঠাৎ।...কথাটা বরঞ্চ বলেই যাই চিমনিকে। কী বলেন?

জিজ্ঞেস করলাম, চিমনি?

আজ্ঞে, বসোবাবুর মেয়ে। আসুন না, চোখের দেখাটা দেখে যাবেন না হয়।

গ্রামের পথে আবছা আঁধার নেমেছে। এখানে-ওখানে কোনো-কোনো বাড়িতে বিদ্যুৎ জ্বলছে। ট্রাঞ্জিস্টার বা রেডিও বাজছে। বাঁয়ে ঘুরে একটা পায়ে চলা রাস্তায় হাঁটতে থাকল ভাঁটু। মাঝেমাঝে সে হাততালি দিচ্ছিল। আবছা আঁধারের ভেতর থেকে কেউ গমগমে গলায় জিজ্ঞেস করছিল, কে বটে? ভাঁটু বলছিল, আমি মিস্তিরি গো, ভাঁটু! মাস্টামশাইকে নিয়ে বেরিয়েছি। শেষবার একজন শুধু নেপথ্য থেকে বলল, নমস্কার মাস্টারমশাই! বলতেই হল, নমস্কার, নমস্কার!

ভাঁটু হাত তালি দিচ্ছিল সাপের ভয়ে। ভাবলাম ওকে বলি সাপ কানে শোনে না। কিন্তু পরে মনে হল, কে জানে। ঝাঁপুইতলার সাপগুলো হয়তো কানে শোনে। এমনি করেই তো ভাঁটুরা আঁধারে চলাফেরা করে বেঁচে আছে।

একখানে কাদা। ভাঁটু বলল, এঃ হে হে! দেখুন দিকিনি, কী বিপদ! আ্যদ্দুর এসে আবার ফেরত যাব?

বললাম, জুতো খুলে যাওয়া যায় না?

একশোবার যায়। ভাঁটু লাফিয়ে উঠল।...বেশি কাদা হবে না। একটুখানি মাত্তর। নিচে পুকুর আছে কিনা। চলুন, ঘাটে ধুয়ে নেবেন।

ঘাটে পা ধোয়া আমার পক্ষে বিপজ্জনকই দাঁড়াল। পুকুরটা কানায়-কানায় ভরা। ঘাটটা বড্ড পিছল। যত কাদা ধোয়া হল, ততটাই প্যান্টের নিচের দিকটায় মেখে গেল। ভাঁটু না ধরে ফেললে একেবারে পুকুরে গিয়ে পড়তাম। ভাঁটু খি খি করে হাসছিল। পা বাড়িয়ে বলল, আর এ পথে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি না। ভাববেন না। সিধে ভাল রাস্তায় পৌঁছে দেব। তবে সঙ্গে টর্চ নিয়ে বেরুলেই ভাল হত।

কালো গাছপালার ভেতর একটুখানি আলো জুগজুগ করছিল। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম, বিদ্যুৎ নয়, লণ্ঠন। লণ্ঠনের সামান্য আলোয় ভাঙাচোরা ইটের স্তূপ, তার ওপর যথেচ্ছ গজানো ঝোপঝাড় আর থুবড়ে পড়া পাঁচিল দেখতে পেলাম। তারপর আচমকা এসে পড়ল ঝাঁঝালো শিউলি ফুলের গন্ধ। ভীষণ চমকে গেলাম।

ভাঁটু মিস্ত্রি ডাকছিল, চিমনিদিদি! অ চিমনি! চিমনি আছ নাকি গো?

লণ্ঠনটা যখন দুলতে দুলতে এল, তখন দেখলাম ওটা খোলা দাওয়ায় রাখা ছিল। চিমনি বলল, কে ? মিস্তিরিকাকা? সঙ্গে কে ?

সে লণ্ঠন তুলে আমাকে দেখার চেষ্টা করায় তাকেও মোটামুটি দেখতে পেলাম। চিমনি নাম শুনে মনে হয়েছিল, কালোই হবে। অবাক হয়ে দেখলাম, কালো তো নয়ই, বরং বেশ ফর্সা। ঝাঁপুইতলায় দেখছি, সব কিছুই বড় অদ্ভুত।

চিমনি আমাকে চিনতে পেরে বলল, ও ! আসুন, আসুন !

ভাঁটু বলল, আরে উঁদিকে সব্বোনাশ ! তোমার বাবাকে নদীর ধারে দেখলাম। সেইরকম নিজের নাম ধরে—

চিমনি থামিয়ে দিয়ে বলল, চুপ করো তো ! সন্ধ্যাবেলা ভারি একটা খবর শোনালে আমাকে।

সে লম্বা পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় গেল। লণ্ঠনটা রেখে আঁধার ঘর থেকে একটা বেরঙা শতরঞ্জি এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিল। একটু হেসে বলল, বসুন মাস্টারমশাই ! মিস্ত্রিকাকা, বসো !

ভাঁটু বসল না। বলল, ফাঁকাতে লিওর পড়বে। বসব না। উঁদিকে মাস্টারমশাইয়ের ইস্কুলের টাইম হয়ে এল।

চিমনি ভুরু কুঁচকে তার দিকে একটা ভঙ্গি করে বলল, ভারি আমার ইস্কুল ! মাস্টারমশাই, বসুন তো আপনি।

অগত্যা ভাঁটু বলল, তা বসবেন তো একটু বসুন—চিমনিদিদি বলছে যখন।

পুরনো টুটাফাটা একতলা ইটের বাড়ির ভেতর সন্ধ্যা রাতে কড়া শিউলির গন্ধ, লণ্ঠনের ফিকে হলুদ আলো, আর চিমনি নামে মেয়েটি মিলে একটা রহস্যাবৃত্ত আমার চারপাশে। ভাঁটু বসে ফের বলল, বসোবাবু আবার কবে থেকে বিগড়ে গেল গো ! সেদিনই তো আমার কাছে বসে গপ্পসপ্প করল। বলল, কপাটখানা ভেঙে আছে। সেরে দিয়ে এসো। আম্মো বললাম, যাব না কেন ? সেন্টারের কাজটা হয়ে গেলেই সেরে দিয়ে আসব।

চিমনি যেন আমাকে দেখছিল। তার জোরালো নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম হঠাৎ। বলল, আপনি যেদিন এলেন, আমিও একই বাসে ছিলাম, জানেন ?

তাই বুঝি ? আপনি কোত্থেকে আসছিলেন ?

চিমনি মুখটা একটু নামিয়ে নরম স্বরে বলল, আমাকে আপনি-টাপনি কেন ? তুমি বলুন মাস্টারমশাই !

ভাঁটুমিস্ত্রি সায় দিল। একশোবার ! চিমনি এই সেদিনকার মেয়ে। দেখতে

দেখতে এতবড়—মানে, মেয়েদের বাড়টা ছেলেদের চাইতে বেশিই হয় বরঞ্চ। আরে মশাই, কী বলব ? এখনও চোখের ওপর দেখছি, ওর মা ওকে ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে পুকুরে ফেলতে যাচ্ছে। চিমনি চিকুর ছেড়ে কাঁদছে। একেবারে ন্যাংটো—

বলেই সে খিক খিক করে হাসতে থাকল। ফতুয়া ঠেলে তার প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দুলতে দেখলাম। চিমনি রাগ দেখিয়ে বলল, তুমি থামো তো বাবা ! একবার মুখ খুললে আর রক্ষে নেই। মাস্টারমশাই, আপনার দেশ কোথায় ?

কাটোয়া।

ও। সে জন্যে আপনার কথায় কেমন যেন টান ! এখানকার লোকেদের ভাষায় 'দখনে টান।'

অবাক হয়ে গেলাম ওর কথা শুনে। বলে কী ? আমার কথায় দক্ষিণ অঞ্চলের টান ? একটু হেসে বললাম, কে জানে ! আমি কিন্তু টের পাইনে ! বরং এখানে এসে লোকের কথাবার্তায় অদ্ভুত একটা টান দেখি।

আমার কথায় পাচ্ছেন ?

স্বীকার করতেই হল। পাচ্ছি না। অবশ্য প্রত্যেকের কথা বলছি না। যেমন হংসধ্বজবাবুর কথায় টান নেই। স্বাভাবিক। কিন্তু হংসধ্বজবাবু তো বলেন না আমার কথায় দখনে টান আছে ?

চিমনি একটু হাসল···হাঁসুজ্যাঠা ? ওঁর কথা ছেড়ে দিন। উনি কি কারুর কথা শোনেন ভাবছেন ? এই মিস্তিরিকাকার মতো নিজে বলতে পারলেই খালাস। অন্যে কী বলছে, কানে ঢোকে না।

ভাঁটু কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। বলল না। আমি বললাম, আপনার কথায় এদের মতো টান নেই। উচ্চারণ খুব পরিষ্কার। কেন বলুন তো ?

চিমনি হাসল ফের। ···আপনি ছাড়লেন না ? ঠিক আছে। তাই-ই। আমি বাবার সঙ্গে প্রায় বছর পাঁচেক কলকাতায় ছিলাম। তারপর বাবার মাথার অসুখ হয়ে চাকরি গেল। তখন আর কী করি, বাবাকে নিয়ে ঝাঁপুইতলা চলে এলাম।

খুব সহজভাবে কথা বলছিল চিমনি। তাই জিজ্ঞেস করলাম, চিমনি আপনার তো ডাক নাম ?

হুঁ। আমার নাম কুন্তলা।

আচ্ছা, চিমনি কেন ডাক নাম হল আপনার ? চিমনি তো কালো জিনিস !

চিমনি জোরে হাসতে গিয়ে সামলে নিল।···আমি কি ফর্সা ?

প্রচণ্ড।

আপনার চোখের জোর আছে, মাস্টারমশাই ! হেরিকেনের আলোয় আমাকে প্রচণ্ড—বাব্বা !

ভাঁটু মিস্ত্রি বলল, না, না। কালো কেন হবে ? কালো নয় বলেই তো চিমনি নামে ডেকেছিল।

আমি অবাক হয়েছি লক্ষ্য করে চিমনি বলল, তুমি থামো তো বাবা ! সবতাতে কথা বলা চাই ! মাস্টারমশাই, চিমনি মানে আপনি কারখানার চিমনি ভেবেছেন তো ? এখানকার লোকে চিমনি কাকে বলে জানেন ? এই যে দেখছেন হেরিকেনের কাচ, এই কাচকে এখানে বলে চিমনি।

ভাঁটু বলে ফেলল, শুধু কাচ না **মাস্টামশাই** ! ওই যে জ্বলছে, তাই সুদ্ধ।

চিমনির মুখটা রাঙা হল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু সে আগের মতো মুখটা একটু নামিয়ে অন্যপাশে রাখল কয়েক সেকেণ্ড। সম্ভবত ওই তাব লজ্জার রূপ। সে ঘুরে পা বাড়িয়ে বলল, একটু চা খান। বসুন !

বললুম, থাক। একটু আগে খেয়ে এলাম। এবার উঠি। আমার ক্লাসের সময় হয়ে এল।

চিমনি কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় আচমকা যে দিক থেকে ঢুকেছি, সেইদিকের ঘন অন্ধকারে কেউ চেঁচিয়ে উঠল, বসন্তো ! বসন্তো আছোঁ ? বসন্তো-ও-ও !

ভাঁটু মিস্ত্রি নড়ে বসে বলল, ওই এসে গেছে।

চিমনি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল সেইদিকে। আবার হেঁড়ে গলায় বসোবাবু ডাকল, ও বসন্ত ! সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ? বসন্তো-ও ! ও বসন্তো !

সাড়া না পেয়ে খেপে গেল এবার। ...অ্যাই শালা বসো ! এত ডাকাডাকি করছি, কানে যাচ্ছে না শুওরকা বাচ্চা ? বসো-ও- ! বসনা-আ-আ ! অ্যাই শালা !

চিমনি লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল। ভাঁটু ফিসফিস করে বলল, উঠুন **মাস্টামশাই** ! পাগলের কাণ্ড। এক্ষুনি কী বলে বসবে আপনি সনমানী লোক।...

ঝাঁপুইতলা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের এই মাস্টাবির চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলাম নেহাত আকস্মিক যোগাযোগে। কলকাতায় একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলাম। এ লাইনের ট্রেনগুলো চলে ছ্যাকড়া গাড়ির মতো। আদ্যিকালের বুড়ো ইঞ্জিন খানিকটা চলেই হাঁসফাঁস করে হাঁফাতে থাকে।

জংধরা চাকায় ঘষটানো বিরক্তিকর শব্দ সারাক্ষণ। একবার দাঁড়িয়ে গেলে আর নড়াচড়ার নামটি নেই। তার ওপর সিঙ্গল লাইন ব্যাণ্ডেল ছাড়ালে।

সময় কাটছিল না। কালনার পর কামরা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। কোণের দিকে রোগা, ঢ্যাঙা গড়নের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সারাপথ মৃদু স্বরে অনর্গল কথা বলতে দেখছিলাম। মুখখানা লম্বাটে, নাকটা প্রচণ্ড খাড়া, একরাশ এলোমেলো কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ এবং পরনে ঝকঝকে সাদা পাঞ্জাবি-ধুতি। চোখে পড়ার মতো চেহারা। যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সে একজন সাদাসিদে গ্রাম্য লোক। গায়ে থানের ফতুয়া, খাটো করে পরা ধুতি, কাঁধে একটা ব্যাগ। সে মাথা নেড়ে মাঝে মাঝে বলছিল, আপনি ঠিকই বলেছেন, বাবুমশাই! ঠিক, ঠিক।

আমার চোখে চোখ পড়তেই বৃদ্ধ একটু হেসে বললেন, এই একটা কেস সারা দেশে অহরহ যা ঘটছে, তারই একটা কমন একজাম্পল্। যে সব কারণের জন্য গ্রামের অসংখ্য লোক জমিজমা খুইয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, আরও নানা ব্যাপারে বঞ্চিত হচ্ছে। তার মধ্যে ভাইটাল কারণ এই একটা। বুঝলেন তো?

নিছক ভদ্রতাবশে জিজ্ঞেস করলাম, কী?

বৃদ্ধ তাঁর পাশের খালি জায়গায় মৃদু থাপ্পড় মেরে ডাকলেন এখানে আসুন।

ভদ্রতাবশেই গেলাম। গ্রাম্যলোকটি ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে আর্তনাদের সুরে বলল, অন্ধ, অন্ধ! চোখ থেকেও অন্ধ গো!

বৃদ্ধ যেন উপভোগ করলেন আর্তনাদটা। চোখে হেসে বললেন, এই লোকটি একজন গ্রামের চাষী। হাইকোর্টে মামলা লড়তে গিয়েছিল। এখন এই যে ও ফিরে যাচ্ছে, গিয়ে কী করবে? ক্ষেতমজুর হবে। হয়তো একদিন ওকে নিজের সেই জমিতেই রক্তজল করে খেটে অন্যের গোলায় ফসল তুলে দিতে হবে।

কেন?

আমার প্রশ্ন শুনে জোরে হাসতে গিয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ গম্ভীর হলেন। খচে যাওয়া গলায় বললেন, হতভাগা জানত না দলিলে কী লেখা আছে! যাকে দলিল পড়ে শোনাতে বলেছিল, সে মহাজনেরই লোক।

ও!

ও মানে কী? বৃদ্ধ আমাকে তেড়ে এলেন। বুঝতে পেরেছেন দেশে কী ঘটে আসছে যুগযুগ ধরে?

থতমত খেয়ে বললাম, পেরেছি।

পারেননি। বৃদ্ধ গলার ভেতর বললেন, যেন বলতে কষ্ট হল। ...লোকটা নিরক্ষর।

আমি চুপচাপ আছি দেখে বৃদ্ধ আবার বললেন, নিরক্ষরতা একটা অভিশাপ।

অগত্যা বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। এ যুগে লেখাপড়া না জানলে পায়ে-পায়ে ঠকতে হবে। চারদিকেই তো ঠক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু—

বৃদ্ধ ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন, কিন্তু কী?

একটু হেসে বললাম, লেখাপড়া শিখেও বা কতটুকু সুবিধে হবে—ধরুন, যাদের জমি বা চাষবাস নেই, কিচ্ছু নেই? আপনি বলছেন নিরক্ষরতা অভিশাপ। কিন্তু লেখাপড়া শেখাও তো অভিশাপ। যেমন আমি।

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বললেন, কতদূর লেখাপড়া শিখেছেন?

আজ্ঞে, বি এ পাশ করেছি বছর তিনেক আগে। আর পড়ার সামর্থ্য ছিল না।

হুঁ, তারপর?

তারপর আর কী? এ পর্যন্ত ডজনতিনেক ইন্টারভিউ দিয়েছি। এখনই দিয়ে এলাম। আমি জানি, আমার চাকরি হবে না। কারণ আমার মুরুব্বি নেই।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। দাড়ি খামচে ধরলেন। তারপর চোখ খুলে মৃদু হেসে আমার দিকে একটু ঝুঁকে এলেন। ...বাড়ি কোথায়? নাম কী?

ষড়যন্ত্র সংকুল কণ্ঠস্বর। একটু অস্বস্তি হল। তবু নাম ঠিকানা বললাম। বৃদ্ধ হাসতে হাসতে বললেন, ইয়ংম্যান! আমি লক্ষ্য করছি, আপনার মধ্যে কোনো কৌতূহল নেই। এই নির্লিপ্ততা অবশ্য আমি ব্যাখ্যা করতে পারি। ক্রমাগত ব্যর্থতা মানুষকে ঠিক তাই করে। কাউকে-কাউকে একেবারে সিনিক করে ফ্যালে। কিন্তু সিনিসিজম একটা ব্যাধি। এই যে আমাকে দেখছেন, আমার নাম হংসধ্বজ রায়, আমার বয়স কত হল বলুন তো? উঁহু পারবেন না। আমার বয়স এই সেপ্টেম্বরে পঁচাত্তর বছর দুমাস হল। অথচ আমি এখনও পুরোদস্তুর সমর্থ। হাঁটাচলা, দৈহিক পরিশ্রম—সবেতেই আমি পটু। আমার মনে বিরক্তি আছে, আমি রাগ করতে জানি আবার তক্ষুনি তা দমন করতেও জানি। গান্ধীজীর নন-কোঅপারেশন মুভমেন্টে আমি জেল খেটেছি। সেই শুরু। তারপর স্বাধীনভারতেও বারকতক জেল খেটেছি। কৃষক আন্দোলন করেছি। শেষে বুঝতে পেরেছি, আদর্শের ধোঁয়ার মধ্যে ছোটাছুটি করে কোনো লাভ নেই, সবই পণ্ডশ্রম। তারচেয়ে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমার নিজস্ব পারিপার্শ্বে, একটা সলিড কিছু—একটা...একটা বাস্তব আর প্রত্যক্ষ কিছু নিয়ে লড়াই করাই ভাল। অতএব আমি লড়ছি। একা লড়ছি। আমাকে সবাই ঠাট্টাতামাসা করে। কেউ বিরুদ্ধতাতেও পিছু পা নয়—যাদের কিনা স্বার্থে ঘা পড়ার চান্স আছে, তাদের টনক নড়ে গেছে। তারা বাধা দিচ্ছে। বাধার মধ্যে একপা একপা করে

এগিয়ে যাচ্ছি। আমি জানি, আমি জিতব। কারণ আমার এ লড়াই একটা সত্যের সপক্ষে লড়াই।...

এতে একটা লাভ হচ্ছিল আমার। বিরক্তিকর রেলগাড়িটাকে ভুলিয়ে দিচ্ছিল হংসধ্বজ রায়ের ওই লম্বা জোড়াতালি দেওয়া সুভাষিতাবলী। বুঝতে পারছিলাম, ভদ্রলোক সারাজীবন এইভাবে অসংখ্য চমৎকার-চমৎকার বাক্য উচ্চারণ করেছেন এবং হাততালিও কুড়িয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে। ওঁর কণ্ঠস্বরেও কী এক মাদকতা অবশ্য আছে, যা কানে লেগে থাকে।

কাটোয়া এসে গেলে পায়ের ধুলো (ধুলোময়লা কথা নয় যদিও) ঝটপট মাথায় নিতে গেলাম, যেন ঋষিদর্শন করেছি এমনতর আঠালো ভক্তি মুখে এঁকে। অমনি খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে প্রায় গর্জন করলেন, না, না। এসব একেবারে অসহ্য। তারপর হো হো করে হেসে বললেন, বিদ্রোহী কবি নজরুল পড়নি? 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ!' কখনও কোথাও মাথা নত করবে না।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল। ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললাম, ঈশ্বরের কাছেও না?

চোখ পাকিয়ে বললেন, ঈশ্বরকে তুমি দেখেছ?

আজ্ঞে না।

তাহলে ও প্রশ্নই ওঠে না।

আসি স্যার!

হংসধ্বজ কপট গর্জন করলেন, আবার স্যার? তারপর বুকপকেট থেকে একটা কার্ড বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, পুজোর পর দেখা কোরো। অতি অবশ্য। আমি তোমার মতো একজন শিক্ষিত যুবক খুঁজছিলাম।

নেমে গিয়ে জানলার ধারে এসে আবার বললাম, আসি তাহলে!

এসো। ভাল থেকো। আর—অতি অবশ্য করে পুজোর পরই...

যাব।...

অক্টোবরে পুজোর পর যখন ঝাঁপুইতলা যাই, তখনও মনে অনেক দ্বিধা ছিল। বাসটা নামিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার পর হাইওয়ের দুধারে ছোট্ট বাজার আর গ্রাম্য মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এ কোথায় এলাম? আমি যে স্বপ্নটা বহুদিন ধরে দেখতাম, তা কলকাতা শহরের। বারবার ছুটে গেছি একটুখানি পা রাখার মাটির খোঁজে, ততবারই কলকাতা আমাকে গলা ধরে বের করে দিয়েছে। তবু কলকাতার জন্য স্বপ্নটা ভাঙেনি। আর আজ এইসব গ্রাম্য মানুষজন, বড় কর্কশ

তাদের কণ্ঠস্বর, ময়ূরপুচ্ছধারী নির্বোধ কাকের গল্পের মতো বৈদ্যুতিক তার, ট্রাঞ্জিস্টারের চিৎকার, কালো কালো শরীর ঘিরে সিন্থেটিক বস্ত্র, ট্রাক-বাস-টেম্পো-সাইকেল রিকশোর বেপরোয়া আনাগোনা, খন্দের বস্তা, গুড়ের টিন, কুমড়োর টিলাপাহাড়,.পাটের গাঁট, ধূর্ত গোলাকার সব চোখ চারদিকে আর কিছু হঠাৎ-বাবু মানুষজনের ফিল্মের ভিলেনসুলভ চেহারা ও হাবভাব—সব মিলিয়ে গা ঘিনঘিন করা একটা অশ্লীলতা! কেন এখানে এলাম?

গ্রাম,বলতে যে ছায়াসুশীতল শান্তির নীড় এবং প্রকৃতি-ট্রকৃতি ভেবেছিলাম, কোথাও তা দেখছিলাম না। একটা লোককে হংসধ্বজবাবুর কথা জিগ্যেস করলে সে হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে বলল, হাঁসবাবু তো? চলে যান।

বাজার ছাড়িয়ে কিছুটা হাঁটার পর হঠাৎ পাখির ডাক কানে আসতেই তাকিয়ে দেখি, অন্য পরিবেশ। কালো জলের পুকুর। সাদা হাঁস। জলের ওপর ঝুঁকে পড়া গাছের ডালে মাছরাঙ্গা পাখি। ফ্রকপরা বালিকা চেরা গলায় 'তই তই' বলে হাঁসগুলোকে ডাকছিল। বিকেল গড়িয়ে এসেছিল। পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া বাছুরের গলায় টুং টুং করে ঘন্টা বাজছিল। তারপর গাঢ় গম্ভীর স্তব্ধতা। বাঁশবনে পাখিদের তুমুল হল্লাও সেই স্তব্ধতার একটা অংশ যেন। জনহীন মাটির পথ। কোথাও-কোথাও সামান্য কাদা। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ বলে উঠল, বাবুমশাই, যাবেন কোথা গো?

ঘুরে দেখি, খেঁটে ধুতি আর হাতকাটা ফতুয়াপরা একটা বেঁটে চ্যাপ্টা মানুষ। বললাম, হংসধ্বজবাবুর বাড়িটা কোথায় দাদা?

বুঝেছি। আপনি তাহলে আমাদের নতুন মাস্টামশাই! আসুন আসুন।

লোকটা ভাঁটু মিস্ত্রি।

অনর্গল বকবক করতে করতে সে আমাকে পোড়ো আগাছাভরা জমির পায়েচলা একফালি রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বারবার তার মুখে 'অ্যাডাল সেন্টার' কথাটা শুনছিলাম। তখনও কিছু বুঝতে পারিনি। শিবমন্দির, ঠাসবন্দি মাটির বাড়ি, আবার একটা পুকুরের পাড় দিয়ে একটা চওড়া রাস্তায় পৌঁছে সে বলল, এই হল আপনার বাবুপাড়া।

বাবুপাড়া দেখে আমার ধারণা অবশ্য বদলাল না। এদিক-ওদিকে কিছু পুরনো ও নতুন একতলা বা দোতলা বাড়ি। বাইরেব বারান্দায় কোথাও কোথাও কিছু বুড়োমানুষ বসে ঝিমোচ্ছেন। ভাঁটু যার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল, ঘোষণা করছিল, আমাদের সেন্টারের মাস্টামশাই। কেউ কোনো কথা বলছিল না। শুধু মাছের চোখে আমাকে দেখছিল। আবার একটা পোড়ো জমি পেরিয়ে গাছপালার

ভেতর একটা একতলা পুরনো বাড়ি দেখিয়ে ভাঁটু আস্তে বলল, সম্ভবত সেটাই তার শ্রদ্ধার ভঙ্গি, ওই হল হাঁসুবাবুর বাড়ি। আর ওই যে বটগাছটা দেখতে পাচ্ছেন? বারোয়ারি মণ্ডপ। তার পাশেই হল গিয়ে আমাদের সেন্টার। মাটির ঘর মাস্টামশাই! এখনও দরজা-জানালা হয়নি। কাঠ এসে গেছে কাল থেকে হাত লাগাব।

বাড়িটার গেটের একপাশে মার্বেলফলকে লেখা ছিল; আশ্রয়। ওপরে ল্যাভেণ্ডার ফুলের ঝাঁপি। থোকাথোকা নীল ফুল ফুটেছে। কাঠের বেড়া সরিয়ে ভাঁটু চাপা গলায় এবং মুচকি হেসে বলল, চলে আসুন।

নিচু পাঁচিল ঘেরা লন বা উঠোনের মতো ছোট্ট প্রাঙ্গণ জুড়ে দিশিবিদিশি হরেক গাছ আর ফুলের ঝলমলানি। ভাঁটু ডাকছিল, বাবুমশাই! বাবুমশাই! এই দেখুন কাকে নিয়ে এসেছি!

ভেতর থেকে সাড়া এল, কে রে?

আজ্ঞে লতুন মাস্টামশাই!

নিয়ে আয়।

সিঁড়ির দুধারে সাজানো ঝাউ। ছাদ থেকে ঝুলে আছে উজ্জ্বল বুগানভিলিয়া। বারান্দায় যেতেই ঘরের ভেতর বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল। দেখলুম, কোণার দিকে মেঝেয় একটা কুকার জ্বলছে। কুকারে কিছু রান্না হচ্ছে। খুন্তি হাতে মোড়ায় বসে আছেন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক—হংসধ্বজ রায়।

মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখে একটু হেসে বললেন, এসে গেছ লক্ষ্মীছেলের মতো? বাঃ! বসো—এক মিনিট। ছিলাম না আজ। কিছুক্ষণ আগে ফিরে রাঁধতে বসেছি। তুমি বসো!

বললাম, আপনি নিজে রান্না করেন দেখছি!

তোমাকে বলেছিলাম আমি স্বাবলম্বী। তুমি বসো আগে।

ঘরভর্তি জিনিসপত্র এলোমেলো ছড়ানো। প্রকাণ্ড সেকেলে খাটে বিছানাপাতা। সেখানেও বই কাগজপত্র, ছোট্ট কাঠের বাকসো—সম্ভবত হোমিওপ্যাথির। খাটের লাগোয়া একটা টেবিলে লেখার সরঞ্জাম। টেবিলটার হাত খানেক উঁচুতে শেড পরানো একটা বাল্ব ঝুলছে।

ভাঁটু একটা গদিআঁটা জীর্ণ চেয়ার টেনে বলল, বসুন মাস্টোমশাই!

হংসধ্বজ হাসতে হাসতে বললেন, তোদের মাস্টার ঘাবড়ে গেছে রে ভাঁটু! আমার রকমসকম দেখে ভাবছে, এ কোথায় এসে পড়লাম! দাঁড়াও, আগে ওকে একপাত্তর চা খাইয়ে দিই। ভাঁটু দেখ তো বাবা, তাকের ওই টিনটাতে বিস্কুট

আছে নাকি। না থাকলে নিয়ে আয়!

ভাঁটু টিনটা খুলে বলল, আছে।

তবে আর কথা কী? ভাঁটু, তুই তাহলে ছাত্তর হারামজাদাগুলোকে খবর দিয়ে আয় এক্ষুণি। নতুন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আগে চেনাজানা হোক। হংসধ্বজ কেটলি চাপিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন ফের, তোমাকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

না তো!

বাইরের দিকে তাকিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন হংসধ্বজ, কয়েকটা দিন থাকো। থেকে দেখ, স্যুট করছে নাকি। তারপর কথা হবে। বরং মনে করতে দোষ কী, আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে এসেছিলাম!

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, না না। আমি থাকব। আমার ভাল লাগছে!

হংসধ্বজ চোখে ঝিলিক তুলে একটু বাঁকা হেসে বললেন, এখনই! লড়াই না করেই?

লড়াই কিসের?

হংসধ্বজ জোরে হেসে বললেন, আছে, আছে। তারপর পা বাড়িয়ে বললেন, এস। বাইরে গিয়ে বসি। ঘরে বড্ড গরম। মুশকিল হল, ফ্যান চালালে কুকার ভালমতো জ্বলবে না। কুকার ভালমতো না জ্বললে আধসেদ্ধ খেতে হবে। তখন পেটের অসুখ হয়ে আমাকে দুষবে। অবশ্যি, ভয় পেও না। ওই দেখ হোমিওপ্যাথির বাকসো।

বাইরের ছায়া গাঢ় হয়েছে ততক্ষণে। ফুলের গন্ধে মউমউ করছে বারান্দা। হাস্নুহানা সম্ভবত। বারান্দায় বেতের চেয়ার ছিল। দুজনে মুখোমুখি বসলাম। তারপর হংসধ্বজ আমার একটা হাত নিয়ে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, যদি তুমি জিততে পারো এ লড়াইয়ে, তোমাকে আমি সব দিয়ে যাব যা কিছু আছে আমার। আমি একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী খুঁজছি।...

বারোয়ারিতলা বলতে একটা পুরনো মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল একটা বটের গাছ। গাছটার গুঁড়ির সামনে অনেকটা জায়গা অর্ধবৃত্তাকারে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে বেদীর মতো। লাল সিমেন্টের বেদীতে বসে যারা আড্ডা দেয়, তারা বয়স্ক। কিন্তু সবাই যে বাবুভদ্রলোক, তাও নয়। বরং বাবুভদ্রলোক কদাচিৎ, চাষাভুযো শ্রমজীবী মানুষরাই বেশি। বটের সীমানা ছাড়ালে একটা পোড়ো কাঁকরভর্তি চটান। আগে নাকি সেখানে ছেলেরা হাডুডু খেলত। বর্ষায় মালামো বা কুস্তি লড়ত। হংসধ্বজ চাঁদির মেডেল আর রঙীন গামছা পুরস্কার

দিতেন। সেখানেই একধারে মাটির দেয়াল তুলে লম্বা-চওড়া একটা ঘর গড়া হয়েছে। ছাদটা টালির, বারান্দাহীন সেই ঘরটাই হংসধ্বজের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। সামনের দেয়ালে একটুকরো কাঠের ফলকে আলকাতরা মাখিয়ে গাঢ় চুনের হরফে লেখা ছিল : 'ঝাঁপুইতলা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। স্থাপিত ১৯৫৮। পরিচালক : হংসধ্বজ রায়।' আমি আসার পর সেটা সরিয়ে নতুন সাইনবোর্ড এঁটেছেন হংসধ্বজ। শহর থেকে সাইনবোর্ড-লিখিয়ে শিল্পীদের দিয়ে সুদৃশ্য ফলক বানিয়ে এনেছেন। নিজের নামটা বাদ দিয়েছেন। তলায় লিখিয়ে নিয়েছেন ইংরিজিতেও একটা লাইন : 'অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার।' ভাঁটু মিস্ত্রিকে চোখ নাচিয়ে মাঝে মাঝে বলেন, ওইটে যেদিন পড়তে আর লিখতে পারবি ভাঁটু, সেদিন তোর গলায় আমি সোনার মেডেল পরিয়ে দেব।

ভাঁটু মুচকি হেসে বলল, বরঞ্চ একছেট হেতের কিনে দিলেই আমি খুশি বাবুমশাই! সোনার ম্যাডেল কি ধুয়ে জল খাব?

হংসধ্বজ বলেন, চোপাখানা দেখ ব্যাটার! যেন ইংরেজি শিখেটিখে এখনই পণ্ডিত হয়ে গেছে। ওই যে সবসময় ছেট ছেট করিস, বল তো কথাটা কী?

আজ্ঞে, ছেট।

হংসধ্বজ হুংকার দিয়ে বলেন, বল্ সেট! এস ই টি সেট! বল্ সেট!

ছেট।

ভাঁটু মিস্ত্রি খ্যা খ্যা করে হাসে। হংসধ্বজ আমাকে বলেন, বাংলা যুক্তাক্ষর হয়ে গেলেই তাকে-তাকে এ বি সি ডি ধরাবে। বুঝেছ তো?...

'ছাত্তর-হারামজাদাদের' রাতের খাওয়াটা সন্ধ্যা নামলেই শেষ হয়ে যায়। ভাঁটু আসে সবার আগে। সে হংসধ্বজের বাড়ি আসে প্রথমে। হ্যাজাগটায় তেল ভরে জ্বেলে নেয়। তারপর সেটা হাতে ঝুলিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে 'সেন্টারের' দিকে আস্তেসুস্থে হাঁটতে থাকে। হ্যাজাগের শোঁ শোঁ শব্দ, তার অনর্গল এলোমেলো বকুনি, আলোর দিকে ছুটে আসা পোকামাকড়ের ঝাঁক, হঠাৎ আলোর বাইরে থেকে কার কণ্ঠস্বর 'নমস্কার মাস্টোমশাই', রোজ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এইসব ব্যাপার যেন একটা অদ্ভুত চালচিত্র, কিংবা একটা মঞ্চনাটকের প্রস্তুতির মতো। অথচ নাটকটা যে কী, তা আমার জানা নেই কিংবা এই চালচিত্রের নিচে কোন প্রতিমা তাও জানি না। সবই জানেন হংসধ্বজ। তিনিই এর নাট্যকার, রূপকার। ভাঁটুর হাতে দুলন্ত হ্যাজাগ। মাটির দেয়ালে, গাছপালায়, ঝোপেঝাড়ে তার চ্যাপ্টা বিশাল ছায়া। হঠাৎ-হঠাৎ চমকে উঠি।

মনে হয়, কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে ? হয়তো নাটকটা চূড়ান্তরকমের হাস্যরসাত্মক। কিংবা এই অদ্ভুত চালচিত্রের তলার প্রতিমা অবয়বহীন কিম্ভূত কোনো দেবতার।

হ্যাজাগের আলোয় দেখা যায় বারোয়ারিতলার বেদীতে কিছু লোক বসে থাকে। ওরা অন্ধকারে বসে ছিল ভাবতেই আমার অবাক লাগে। তাদের কেউ কেউ আমাকে নমস্কার করে। কেউ কেউ অনুসরণ করে। আলোর ছটায় ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা লোকগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখি। চুপচাপ গম্ভীর মুখে কপালে হাত ঠেকিয়ে তারা ঘরে ঢোকে। কোণে গুটিয়ে রাখা চাটাইগুলো বিছিয়ে ফেলে ঝটপট। প্রত্যেকের হাতে শ্লেটপেন্সিল আর চটি বর্ণবোধ। ভক্তিতে গাঢ় হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে তারা। আমি ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়াই। মৃদু হাসির রেখা টেনে দিই ঠোঁটে। ভাঁটু হ্যাজাগটা একটা উঁচু টুলের ওপর রাখে। তাক থেকে চকের বাক্সোটা এগিয়ে দেয় আমাকে। তারপর সামনের সারিতে বসে পড়ে। এতক্ষণে দেখতে পাই তার বগলে একটা শ্লেট আর বর্ণবোধ গোঁজা ছিল। ফতুয়ার পকেট থেকে সে পেন্সিল বের করে। বর্ণবোধ খুলে ঝুঁকে পড়ে। আলোয় তার টাক ঝলমল করে ওঠে। আমি হাসি সম্বরণ করি।

প্রথমে কিছুক্ষণ পড়া। তারপর হরফ লেখা। হরফ লেখার পর আঁক লেখা। শেষে সুর ধরে নামতাপড়া। প্রথম-প্রথম প্রচণ্ড হাসি পেত। ধেড়ে নানাবয়সী লোক, তাদের মধ্যে চুলপাকা বুড়োও জনাকতক, অদ্ভুত উচ্চারণে বর্ণবোধ পড়ার হাট বসিয়ে ছাড়ে। কেউ অবশ্য এগিয়ে আছে, কেউ পিছিয়ে। কেউ বিকট হেঁকে 'বর্গিজ্জ' ল জ্জল পড়ে, কেউ স্বরে অ স্বরে আ, কেউ লি লি অর্থাৎ ঋ লি উচ্চারণের জন্য আর্তনাদ করে। বেশি চেঁচামেচি হলে সর্দারিপোড়ো ভাঁটুই হুঙ্কার দেয়, আস্তে ! আস্তে ! কিন্তু সবচেয়ে হাসি পায় 'শটকে' আওড়ানোর সময়। স্তব্ধ নিঝুম গ্রামটাতে ডাকাত পড়ার ব্যাপার। এই সময় প্রায় একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কে কতটা জোরে শটকে আওড়াতে পারে। আমার কানে তালা ধরে যায়। ধমক দিলেও কেউ গ্রাহ্য করে না। মুখে হাসি টেনে দিয়ে বিকট চেঁচায়, তিনের পিঠ্ঠে তিন—তেত্তিরি-ইশ ! তিনের পিঠ্ঠে চাইর—চৌত্তিরি-ইশ ! তারপর 'একে শোন্য দশ, দশে শোন্য শ-অ-অ', বিশাল শব্দে ফোঁস করে প্রকাণ্ড বেলুন ফেঁসে যাওয়ার ব্যাপার। আচমকা গম্ভীর স্তব্ধতা। পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকে লোকগুলো।

এবার হংসধ্বজের আসার প্রতীক্ষা। টর্চ আর প্রকাণ্ড কেটলি হাতে তিনি

আবির্ভূত হবেন। টর্চের ছটা চত্বরে পড়লেই আবার হুলুস্থুলু পড়ে যায়। তাকে একগুচ্ছের মাটির ভাঁড় আছে। ভাঁড়ের গায়ে আলকাতরা দিয়ে প্রত্যেকের নাম লেখা। যার-যারটা ঠিকই চিনে নেয়। হংসধ্বজের শিক্ষাপদ্ধতির এও একটা অংশ। হংসধ্বজ হাসিমুখে চা ঢেলে দেবেন লাইনে দাঁড়ানো ছাত্রদের। যে-যার কাপ ততক্ষণে পাশের টিউবেল থেকে ধুয়ে এনেছে। প্রসাদ গ্রহণের মতো চা নিচ্ছে। দাঁড়িয়ে বা বসে চুমুক দিচ্ছে। খাওয়া শেষ হলে আবার টিউবেলের জলে ধুয়ে এনে ঘরের দেয়ালে লম্বা তাকে উপুড় করে রেখে দেবে। হংসধ্বজের ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই। একটা প্যাকিংবাক্সে সব সময় কিছু নতুন ভাঁড় মজুত। নতুন ছাত্র এলে একটা ভাঁড় তার প্রাপ্য। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট টিনে রাখা আলকাতরায় ডুবোনো কাঠিটি তুলে পরিষ্কার হরফে তার নাম লিখে দেবেন। বলবেন, চিনে রাখ। ভুল হয় না যেন। কিন্তু নতুনরা ভুল করবেই। সে-রাতে উমেশের ভাঁড়ে উপেন চা খাওয়ার পর খুব হাসাহাসি পড়ে গিয়েছিল। উমেশের চেয়ে উপেন-জাতে খাটো। উমেশের মুখ ব্যাজার দেখে ভাঁটু বলেছিল, হ্যাঁ রে, বাজারে যেয়ে যে জগনের কাছে গেলাসে মুখ দিয়ে চা খাস, তাতে কত মোছলমানের মুখ ঠেকেছে, জানিস ? উমেশ তুম্বো মুখে বলেছিল, ধুর মশাই ! বাজার-ফাজারের কথা সিটা। ইখেনে কি তাই চলে ? তার মানে, বাজারে যা চলে, গ্রামের ভেতর তা চলে না। গ্রাম তো আসলে সমাজ। তবে উপেন বলেছিল, আরে রুমেশদা, জাত খেলে যায় না, বললে যায়। অর্থাৎ খাওয়াদাওয়া যদি বা একপাত্রে করেই ফ্যালো, মুখে সেটা না উচ্চারণ করলেই হল। হংসধ্বজের মতে, জাতপাতের ব্যাপারটা সমাজের নিচুতলাতেই বেশি। ট্রাইবাল প্রেজুডিস। বুঝলে তো ? তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, মুসলমান ছাত্র আছে জনা পাঁচেক। তাদের চায়ের ভাঁড়গুলো আলাদা তাকে থাকে। দেখেছ কি ?

দেখেছি।

ওদের ভাঁড়ে নাম লিখতে হয় বলেই লিখেছি। কিন্তু না লিখলেও চলত। হংসধ্বজ বলেছিলেন। মাসে অন্তত একবার আমরা ফিষ্টি করি। প্রত্যেকে চালডাল তরিতরকারি নিয়ে আসে। খিচুড়িই করা হয় বেশির ভাগ সময়। খিচুড়ির সঙ্গে মাছভাজা। আমি নিজের পুকুর থেকে মাছ দিই। তো তুমি দেখবে, খেতে বসেছে সবাই। পাশাপাশি খাচ্ছে বটে, কিন্তু বায়েনদের যারা, তারা একসঙ্গে বসেছে। তেমনি কুনাই যারা, তারা পাশাপাশি একসঙ্গে। আবার চাষী সদ্গোপ যারা, তারাও একত্র। বাগিদ্‌পাড়াও যারা, তারাও একসঙ্গে বসে খাচ্ছে। আর দেখবে মুসলমান ছাত্ররা বসেছে খানিকটা তফাতে। সেদিন

কথায়-কথায় মুসলমান পাড়ার তোরাপ হাজি আমাকে ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন, কী হাঁসুবাবু ? ছেলেগুলানের জাত মেরে দিলেন যে ! ইসলামধর্মে জাতিভেদ নেই। কিন্তু এই যে হিঁদু পাড়ায় এসে খেয়েছে, এটা সুনজরে দেখছে না ওদের সমাজ। তোমাকে বলেছিলাম, ঝাঁপুইতলা এখনও বড্ড প্রিমিটিভ। অনেক পিছনে পড়ে আছে। তবে জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই করে লাভ নেই। তুমি ওদের লেখাপড়া শেখাও। দেখবে ক্রমে ক্রমে ও ব্যাপারটা চলে যাচ্ছে।... একটা ব্যাপারে খুব অবাক লেগেছিল। গ্রামটা মোটামুটি বড়ই। অন্তত হাজার তিনেক লোক বাস করে। অথচ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে লেখাপড়া শিখতে আসে মাত্র জনা বাইশ লোক। আমি আসার আগে নাকি মাত্র জনা ষোল আসত। হংসধ্বজ নিজেই পড়াতেন। এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাঁর একার উদ্যোগ। সরকারি গ্র্যান্ট নেন না। কারণ তাহলে কমিটি করতে হবে। সরকারি লোক এসে ছড়ি ঘোরাবে। হংসধ্বজ সারাজীবন একেশ্বর-স্বভাবের মানুষ। তাছাড়া পাঁচজন মুরুব্বি জুটলেই ঝামেলা বাড়বে। এমন কী কলকাতার কোনো-কোনো বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান নাকি এসব ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। হংসধ্বজ তাও নিতে চান না। এসব কথা তুললেই বলেন, এ আমার একার লড়াই।

কেন এটা একটা লড়াই, কয়েকটা দিন পরেই বুঝেছিলাম। হরনাথ নামে এক মধ্যবয়সী ছাত্রের মেধা দেখে চমকে গিয়েছিলাম। হংসধ্বজের কাছে সে বর্ণবোধ প্রথমভাগ শেষ করেছিল। আমি আসার পর যুক্তাক্ষর শিখছিল সে। কয়েকদিনেই লক্ষ্য করলাম, সে চমৎকার রিডিং পড়তে পারছে। চার সংখ্যার ভাগের অংক কষেও আমাকে সে তাক লাগিয়ে দিল। রোগা, হাড়জিরজিরে চেহারা, মাথাটা প্রকাণ্ড। তার মাথা দেখিয়ে ভাঁটু সবসময় রসিকতা করত মা সরস্বতীর পায়ের লাথি খেয়ে চেপ্টে গেছে বলে। হংসধ্বজ তাকে খুশি হয়ে নিজের ধুতি-পাঞ্জাবি উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাকে নাকি পরানো যায়নি। ছেঁড়া গেঞ্জি আর খাটো লুঙ্গি পরে আসে হরনাথ। মুখে সবসময় লাজুক ভাব। বড়-বড় দাঁত খুলে হাসে। একটু নোংরা থাকা যেন ওর স্বভাব। জিগোস করেছিলাম, তুমি কী করো হরনাথ ?

লাজুক ভঙ্গীতে বলেছিল, আজ্ঞে, মাঠে খাটি।

মাঠে তো সবাই খাটে।

আমার কথা শুনে ভাঁটু হাসতে হাসতে বলেছিল, খুলে বল না হেরো, মুনিশ খাটিস !

তোমার জমি নেই বুঝি ?

হরনাথ তেমনি হেসে মাথা নেড়েছিল।

একদিন দেখি হরনাথ ক্লাসে আসেনি। আসলে সেই প্রথম ওকে দেখার পর আমার মাথায় হংসধ্বজের নেশাটা একটু ঢুকে পড়েছিল। পরদিনও সে এল না। ভাঁটুকে জিগ্যেস করলাম। সে বলল, খোঁজ নিয়ে দেখবে। পরদিনও হরনাথ না এলে আমার খারাপ লাগল। ভাঁটু বলল, ওর দেখাই পাইনি। দু-দুবার গেছি।

হরনাথের কাছাকাছি বাড়ি উদয়ের। সে বলল, হেরোদা আর আসবে না।

সে কী! কেন?

তা বলতে পারব না মাস্টোমশাই। বলছিল আর আসবে না।...

পরদিন সকালে নকুলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওর খোঁজে। নকুল হংসধ্বজের ফাইফরমাস খাটে। সেও একজন বয়স্ক ছাত্র। নকুল আমাকে গ্রামের শেষপ্রান্তে নিয়ে গেল। একটা লম্বাটে পুকুরের পাড়ে ঠাসবন্দি সব মাটির বাড়ি, খড়ের চাল। কোনো চালে কেয়াপাতা বা আস্ত তালপাতা চাপানো। বৃষ্টি খেয়ে ঝাঁঝরা এবং শাদা হয়ে গেছে। ঘরগুলোকে কুঁড়েঘর বলাই ঠিক। দাঁত বের করা এই সব বাড়ি যেন দারিদ্রের কুৎসিত চেহারাই। নকুল বলল, মাস্টোমশাই! এটা হল যেয়ে কুড়রপাড়া। সব মুনিশখাটা লোক আজ্ঞে।

হরনাথের বাড়ি বলতে প্রায় থুবড়ে পড়া একটা নিচু ঘর। খোলা উঠোনে হরনাথের বউ তালাইয়ে ধান শুকোচ্ছিল। একদঙ্গল ন্যাংটো ছেলেমেয়ে কী একটা করছিল, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হরনাথের বউ অনেকটা ঘোমটা টেনে এবং পিঠের দিকে খাটো নোংরা শাড়িটা বার বার টানতে টানতে পা দিয়ে সেদ্ধ ধানগুলো ঠেলতে থাকল। নকুল বলল, হেরো কৈ গো? তখন সে কাজ থামাল।

নকুল ফের বলল, হেরো নেই বুঝি?

হরনাথের বউ ঘোমটার ভেতর থেকে ঝাঁঝালো স্বরে বলল, ঘরে বসে থাকলে পেট চলবে? কাজে গেছে।

নকুল রাগ চেপে হাসল। ...হ্যাঁ গো, হেরো সেন্টারে যায় না কেন বলো দিকিনি?

হরনাথের বউ গলার ভেতর বলল, সেন্টারে যাবে আর রাত করে বাড়ি ফিরবে। ভোরে উঠতে পারবে না। মনিব এসে গালমন্দ করবে। ভারি আমার বলছে সেন্টারে যায় না ক্যানে!

নকুল এবার রাগটা দেখাল।...সবাই ভোরে উঠতে পারে। আর হেরোদা

পারে না ? তার চাইতে আসল কথাটা বল। সেন্টার থেকে এসে কপিলের কাছে গ্যাঁজা টানে।

হরনাথের বউ চেঁচিয়ে উঠল। খামোকা লোকের বাড়ি বয়ে বদনাম দিতে এসো না তো! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। আমার ছোটলোকের মুখ!

নকুল গুম হয়ে বলল, চলে আসুন মাস্টোমশাই! এরা কি মানুষ ভাবছেন ? এদের উবকার করতে যাওয়াই দোষ।

পেছনে হরনাথের বউকে বলতে শুনলাম, ভারি আমার উবকার! ন্যাকাপড়া শিখে পণ্ডিত হবে! হাঁসুবাবু না হয় বড়লোক। তেনার রঙ লেগেছে বলে তো আর সবার রঙ লাগেনি!

সেদিনই বিকেলে ভাঁটুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছি, ভাঁটু এই নদীর একটা জম্পেশ গল্প জুড়েছে, হঠাৎ একটু তফাতে পাটক্ষেতের দিক থেকে হরনাথকে বেরুতে দেখলাম। আমাদের দেখেই সে থমকে দাঁড়াল। তারপর না-দেখার ভান করে আবার পাটক্ষেতের ভেতরে ঢুকে গেল। ডাকলাম, হরনাথ! হরনাথ! শোনো!

ভাঁটু বলল, কৈ হেরো ?

ওই তো পাটক্ষেতে ঢুকে গেল!

ভাঁটু চোখ নাচিয়ে বলল, আসুন তো! ওকে শেয়ালধরা করে ধরে ফেলি দুজনে!

সে দৌড়ে চলে গেল পাটক্ষেতের দিকে। ব্যাপারটা বেশ তামাশার। আমি অবশ্য দৌড়ুলাম না। লম্বা পায়ে এগিয়ে গেলাম। ভাঁটু পাটক্ষেতে ঢুকে পড়ল। তারপরই আবার হরনাথকে দেখতে পেলাম, ঝোপঝাড়ের ভেতর গুঁড়ি মেরে চলেছে! চেঁচিয়ে ডাকলাম, হরনাথ! হরনাথ!

ভাঁটু পাটক্ষেত ফুঁড়ে বেরিয়ে বাঘের মতো গিয়ে পড়ল হরনাথের ওপর। হরনাথের কাঁধ ধরলে সে বিব্রতভাবে সোজা হল! আঃ! ছাড়ো মিস্তিরিদা। লাগছে। বলে সে ঘুরে আমাব উদ্দেশ্যে কপালে একটা হাত ঠেকাল।

ভাঁটু তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল আমার কাছে। সে প্রচুর হাসছিল, কিন্তু তার আচরণ যথার্থ সর্দারিপোড়োর। হরনাথের পরনে নিছক কৌপিনের মতো পরা একটুকরো গামছা। হাতে একটা নিড়ানি। বললুম, কী খবর হরনাথ ?

আজ্ঞে, আউস নিড়াচ্ছিলাম।

তুমি সেন্টারে যাওয়া বন্ধ করলে কেন ?

হরনাথ মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ভাঁটু তার পাঁজরে আঙুলের গুঁতো

মেবে বলল, মলো রে! বোবায় ধরল নাকি?

হরনাথ বিরক্তভাবে একটু সরে বলল, আঃ! কী করো মিস্তিরিদা! সব তাতেই খালি ফুককুরি তোমার। ইদিকে আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

বললাম, কী হয়েছে বলো তো হরনাথ?

হরনাথ লাজুক মুখ করে করুণ হাসল।...আমার কপালে ওসব নেইকো মাস্টামশাই! মেজবাবু খুব বকাবকি করছে। তেনার ঘরে 'বাঁধা' লেগেছি এদানিং। দিনমান মুনিশ খাটি মেজবাবুর জমিতে। সন্ধ্যাবেলা যেয়ে গরুবলদের জন্যে খ্যাড় কাটি। অনেকগুলান গরু কি না। খ্যাড় কেটে জাবনা দিতে একপোহাব রাত।

ভাঁটু বলল, মিছে কথা! তাহলে অ্যাদ্দিন সেন্টারে আসছিলি কেমন করে?

বউকে খ্যাড় কাটতে পাঠাতাম যে! হরনাথ কাঁচুমাচু মুখে বলল। কিন্তু মেয়েছেলের হাতে খ্যাড় কাটা পছন্দ হয় না মেজবাবুর। বলে রাত পুইয়ে যাচ্ছে একপাঁজা খ্যাড় কাটতে।

বললাম, বেশ তো! তুমি খড় কাটা শেষ করেই আসবে। আমি তোমার জন্যে বসে থাকব—যত রাত্তির হোক। তোমাকে একাই পড়াব।

হরনাথ জোরে মাথা দোলাল।...আজ্ঞে পারব না মাস্টারমশাই। ক্ষ্যামা দেবেন।

কেন পারবে না?

আজ্ঞে মেজবাবু বকবে। উনি আমার রুজির মালিক, মাস্টারমশাই!

বলেই সে পালিয়ে যাওয়ার মতো পা ফেলে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে চলে গেল। দেখলাম, সে বাঁধের নিচে একটা কচি আখের ক্ষেতে গিয়ে ঢুকল এবং হুমড়ি খেয়ে কিছু করতে থাকল। ভাঁটু গরম শ্বাস ছেড়ে বলল, বুঝতে পেরেছি!

জিগোস করলাম, কী বুঝতে পেরেছ ভাঁটু?

আমাদের হাঁসবাবুকে গোড়া থেকে মেজবাবু বাধা দিয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, পাড়ায় পাড়ায় নিজে গিয়ে ভাংচি দিয়ে বেড়ায়। বলে, বুড়োবয়সে লেখাপড়া শিখে কি দশখানা হাত গজাবে তোদের? খালি কম্ম নষ্ট করা। এই তো দেখুন না। আমাকেই কি কম ভাংচি দিয়েছিল মেজবাবু? এখনও দেখা হলে ঠাট্টা করে বলে, কী রে ভাঁটু? কখানা পাস দিলি? কালই বাজারে দেখা। বললে, এই যে ভাঁটুপণ্ডিত! মেজবাবু—

কে মেজবাবু!

বালিজ্যেদের মেজজনা। ভাঁটু পা বাড়িয়ে বলল। একসময় উনারা

ঝাঁপুইহাটির জমিদার ছিলেন। সে দাপট কবে ঘুচে গেছে। কিন্তু ফুটানি যায় নি।

নাম কী ভদ্রলোকের?

চন্দ্রকান্ত বালিজ্যে।...

ঘটনাচক্রে খানিকপরেই চন্দ্রকান্তবাবুর দেখা পেলাম। শক্তসমর্থ গড়নের মানুষ। পরনে লুঙ্গি আর ধবধবে শাদা হাফহাতা ফতুয়া। চেহারায় বনেদি ভাবটা স্পষ্ট। হাতে একটা ছড়ি। বাঁধে সূর্যাস্ত দেখার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবে ভাঁটু চাপা গলায় বলল, জমি দেখতে বেরিয়েছে। ওই উঁচুতে দাঁড়িয়ে প্রিতিদিন একবার করে মাঠ মাপতে আসে মেজবাবু।

বাঁধে উঠে নমস্কার করলে চন্দ্রকান্ত চোখের কণা দিয়ে আমাকে দেখে মাথাটা একটু নাড়লেন মাত্র। ভাঁটু প্রণাম করে বলল, আমাদের সেন্টারের নতুন মাস্টামশাই মেজবাবু!

মেজবাবু বললেন, অ।

একটু ইতস্তত করে বললাম, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল মেজবাবু।

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, বলুন।

আমি আপনার একটু সাহায্য চাই।

কিসে?

আমাদের অ্যাডাল্ট এডুকেশান সেন্টারের ব্যাপারে।

পাবেন না।

কেন পাব না?

চন্দ্রকান্ত ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে। দেখুন মশাই, হাঁসুদা এক বদ্ধ পাগল বলে আমি তো পাগল হয়ে যাইনি। ওইসব ছোটলোকগুলোকে ক খ শিখিয়ে হাঁসুদা ভাবছে বিরাট একটা কিছু করলাম। কিন্তু এতে ওদের কী ক্ষতি করা হচ্ছে, তা ভেবে দেখছে না। কাজকম্ম পণ্ড করে নিজেদের তো বারোটা বাজাচ্ছেই, আমাদেরও ভবিষ্যত ঝরঝরে করে দিচ্ছে। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী জানেন না? দু অক্ষর পড়তে না পড়তে এখনই ব্যাটাদের মুখে বুলি ফুটেছে। এরপর তো বাবু হয়ে ছড়ি ঘোরাতে আসবে আমাদের মাথার ওপর।

বলে হাতের ছড়িটি আকাশে একবার ঘুরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। আড়চোখে দেখলাম, ভাঁটু মিস্তিরি উদাস চোখে নদীপারের আকাশ দেখছে। কিন্তু চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। নাকের ফুটো গুলতির মতো ফুলে রয়েছে।

বললাম, আপনি ব্যাপারটা ভুল বুঝেছেন, মেজবাবু! আসলে—

থামুন তো মশাই ! চন্দ্রকান্ত ধমক দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিলেন । আর কোথাও কাজকম্ম পাননি—এসে জুটেছেন ঝাঁপুইতলায় বিদ্যে বিলোতে । পেটে যেটুকু আছে অন্যত্র গিয়ে বিলোন, এ বড় কঠিন ঠাঁই ।

লোকটি অভদ্র । রাগে শরীর রি রি করছিল । ভাঁটু গলার ভেতরে বলল, চলে আসুন মাস্টামশাই । খামোকা কথা খরচ করে কী লাভ ?

চন্দ্রকান্ত গর্জন করলেন, ভাঁটু ! আমার কাজে কবে হাত দিবি ? রোজ ডেকে পাঠাচ্ছি, আর যে মুখ দেখাস নে রে, খুব রোয়াব হয়েছে, তাই না ?

ভাঁটু হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল, সেন্টারের কাজ শেষ না করে আর কোনো কাজে হাত দোব না মেজবাবু—সে আপনি যতই বলেন ।

আচ্ছা রে আচ্ছা ! চন্দ্রকান্ত পেছন থেকে শাসালেন । দেখব এ রোয়াব কোথায় থাকে ?

কিছুদূর চলার পর ভাঁটু বলল, আপনি কাজটা ঠিক করেননি মাস্টামশাই ! হাঁসুবাবু শুনলে রাগ করবেন । মেজবাবু একটা হারামজাদা লোক । বলছিলাম না, কবে জমিদারি গেছে, এখনও ফুটানি যায়নি ! চার ভাইয়ের মধ্যে বিঘে পঁচিশ করে জমি আর একটা এজমালি পুকুর । নিজেদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা লেগেই আছে । কিন্তু মজাটা কী জানেন ? ওনার এক জামাই উকিল-বেরিস্টর । তারই রোয়াবে রোয়াব । ছোট মেয়েটা কলেজে পাশ দিয়েছে । ছেলের বেলায় তো ঘণ্টা । মাত্র দুই মেয়ে । একটাকে বড় জায়গায় লাগিয়ে দিতে পাঁচবিঘে গেছে । এটার বেলায় আরও কত বিঘে যাবে দেখবেন ।

ভাঁটুর বকুনি থামিয়ে দিয়ে বললাম, ভাঁটু ! কথাটা যেন হাঁসুবাবুকে বোলো না তাহলে ।

আপনার মাথা খারাপ ? ভাঁটু আশ্বাস দিল ।...

চিমনির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরদিন সকালে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের ঘরটার সামনে টুলে বসে আছি । ভাঁটু মিস্ত্রি বাটালি দিয়ে কাঠ কাটছে আর বকবক করে যাচ্ছে । নকুল দুজনকে চা খাইয়ে বলে গেল, বাবুমশাই বহরমপুর গেলেন । ঘরের চাবি দিয়ে গেছেন । এই নিন !...আজকাল মাঝেমাঝেই নকুলই রান্না করে । সে হয়তো রাঁধতেই গেল । কিচেনটা অনেককাল বাদে সাফ করা হয়েছে ।

নকুল যাওয়ার একটু পরে বারোয়ারি তলার দিকে হাঁক শুনতে পেলাম, বসন্তো ! বসন্তো-ওও !

ভাঁটু মুখ তুলে হাসল ।...এই রে । এদিকেই আসছে দেখছি । জ্বালিয়ে মারবে দেখবেন ।

পাগল বসন্তবাবুকে মাত্র একবারই দেখেছি, দূর থেকে নদীর ধারে । তারপর গতরাতে ওঁর বাড়ি থেকে ভাঁটু টানতে টানতে সরিয়ে এনেছিল । নৈলে মুখোমুখি দেখা হত । এখন উজ্জ্বল সকালের আলোয় ভদ্রলোককে দেখে অবাক লাগল । পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে গায়ের রঙ । লম্বাটে মুখ । খাড়া নাক । চোখদুটো কোটরগত, কিন্তু প্রচণ্ড উজ্জ্বল । পরনে ময়লা ছাইরঙা পাঞ্জাবি আর ধুতি । ধুতির কোঁচাটা পকেটে ঢোকানো । খালি পা । মুখ উঁচু করে ডাকতে ডাকতে আমার দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন ।

ভাঁটু গোল চোখে তাকিয়ে রইল । বসন্তবাবু সোজা চলে এলেন আমার কাছে । তারপর করজোড়ে নমস্কার করে একটু হেসে বললেন, নমস্কার স্যার ! কেমন আছেন ?

হাসি চেপে বললাম, ভাল । আপনি ভাল তো ?

খুব ভাল । বসন্তবাবু একটু তফাতে ঘাসের ওপর বসে পড়লেন কৈ. একটা সিগারেট দিন, টানি ।

সিগারেট দিয়ে ধরিয়ে দিলাম । অদ্ভুত ভঙ্গীতে সিগারেটটা ধরে বারকতক টেনে ধুস বলে ফেলে দিলেন । তারপর বললেন, একটা কথা জিগ্যেস করব স্যার ? যদি না কিছু মনে করেন !

না, না । কিচ্ছু মনে করব না ।

আপনি ম্যারেড, না আনম্যারেড !

একটু অবাক হয়ে বললাম, আনম্যারেড । কেন বলুন তো ?

বসন্তবাবু আরও একটু এগিয়ে এলেন । চোখ নাচিয়ে বললেন, জাতি পরিচয় ?

ভাঁটুমিস্তিরি হাসিমুখে ঠোঁট ফাঁক করে তাকিয়ে ছিল । বলে উঠল, ক্যানে গো বসোবাবু ! মেয়ের বে দেবে নাকি ? আমাদের মাস্টার খাঁটি বামুনের ছেলে । সে গুড়ে বালি । আপনি হলেন গে কায়েত ।

বসন্তবাবু একটুকরো কাঠ তুলে নিয়ে বললেন. মারব শালাকে এক ঘা ! সব কথাতে ফোড়ন কাটা চাই ।

ভাঁটু ভয় পাওয়া গলায় বলল, মাস্টামশাই ! কাঠখানা দয়া করে কেড়ে নেন । বিশ্বাস নেই পাগলকে ।

বসন্তবাবু কাঠটা মেরেই বসেছিলেন প্রায় । কেড়ে নিলাম হাত থেকে । রাগী

চোখে তিনি ভাঁটুর দিকে তাকিয়ে হাঁসফাঁস কবতে করতে বললেন, তুই পাগল। তোর চোদ্দপুরুষ পাগল। আমাকে বলে পাগল। বলুন তো মশাই, আমি পাগল, না ওই ব্যাটা পাগল?

বললাম, না, না। ভাঁটুই পাগল।

বসন্তবাবুর রাগটা পড়ে গেল। ফিক করে হেসে বললেন, আরেক পাগল ছিল জানেন? বসোপাগল। আসল নাম বসন্তকুমার রায়। কলকাতায় ভাল চাকরি করত। মাসে আটশো টাকা মাইনে। হঠাৎ ব্যাটাচ্ছেলে পাগল হয়ে পালিয়ে এল ঝাঁপুইতলায়। তা না হয় এল। যাবেই বা কোন চুলোয়, বলুন? পৈতৃক একটা ভিটে ছিল। সেখানেই না হয় এসে মাথা গুঁজল। কিন্তু তারপর হঠাৎ উধাও—একেবারে নিপাত্তা। মেয়েটা এদিকে কেঁদে-কেঁদে সারা। বুঝলেন?

বসন্তবাবু ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়লেন। পাঞ্জাবিতেই নাক আর চোখদুটো ঘষটে মুছলেন।

তারপর বললেন, আমার হয়েছে জ্বালা। খুঁজে খুঁজে হয়রান। সারাদিন সারা রাত—এই যে দেখছেন, বেরিয়ে পড়েছি।

ভাঁটু ছেনিতে হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে হাসি চেপে বলল, তাহলে আপনি কে গো? বসন্তবাবু গর্জালেন, চোওপ শালা! যা বলার এনাকে বলব। আমি কে? ন্যাকা! বলে হাসিমুখে আমার দিকে ঘুরলেন ফের। ভুরু নাচিয়ে বললেন, বলুন তো আমি কে? বলতে পারলেন না তো? হুঁ—হুঁ বাবা।

কে আপনি?

তা বলব না। আমি বলি আর চাদ্দিকে ঢিঢি পড়ুক।

ভাঁটু বলল, আহা, বলুন না! আর তো কেউ নেই এখানে।

বসন্তবাবু রুষ্ট চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিজের মুখের পাশে একটা হাত তুলে একটু উঁচু হলেন। যেন ভাঁটু না শুনতে পায়, এভাবে ফিসফিস করে বললেন, পাঁচুগোপাল মিত্তির। কাউকে বলবেন না যেন।

ভাঁটু মিস্ত্রি ফিতে হাতে উঠে গেল জানালা মাপতে। বসন্তবাবু কথাটা বলে চোখ বুজে বিড়বিড় করছিলেন। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বললেন, একটা টাকা হবে স্যার? দিন না একটা টাকা।

টাকা কী করবেন?

বাসভাড়া লাগবে। বাসভাড়ার অভাবে একবার গোপগাঁ যাওয়া হচ্ছে না।

সেখানে কেন যাবেন?

বসন্তশালা সেখানেই আছে মনে হচ্ছে? ওর বোনের বাড়ি গোপগাঁ।

একটা টাকা দিলাম। টাকাটা পকেটে গুঁজেই বসন্তবাবু ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই চেরা গলায় তাঁর হাঁক ভেসে এল, বসন্তো-ও ! বসন্তো-ও-ও !

ভাঁটুর উদ্দেশ্যে বললাম,বুঝলে ভাঁটু ? নিজেকে হারিয়ে ফেললে মানুষের এই সমস্যা হয়। ভদ্রলোক কীভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন কে জানে !

ভাঁটু কথাটা বুঝবে না জানতাম। সে শুধু বলল, আজ্ঞে ? তাই বটে !

ছায়ায় বসে ছিলাম। রোদ এসে পড়লে টুলটা সরিয়ে ঘরটার দেয়াল ঘেঁষে পেতে বসতে যাচ্ছি, কেউ ডাকল, মিস্তিরিকাকা ! ও মিস্তিরিকাকা !

ঘুরে দেখি শুকনো কঞ্চি হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসছে একটি মেয়ে। বছর বাইশ-তেইশের মধ্যে বয়স বলে মনে হচ্ছিল। ফিকে নীল শাড়ি পরনে, ছাইরঙা ব্লাউজ, খালি পা। মুখ দেখে চেনা লাগছিল। কাছে আসতেই চিনতে পারলাম। কাল রাতে হেরিকেনের আলোয় দেখেছিলাম। এখন সকালের ঝকমকে রোদ্দুরে দেখতে গিয়ে চোখ জ্বলে গেল যেন।

চিমনি এসে দাঁড়াল। আলতো হেসে বলল, এই যে মাস্টামশাই ! তারপর ভাঁটুর দিকে ঘুরে বলল, মিস্তিরিকাকা, বাবাকে দেখছ গো ?

ভাঁটু বলার আগেই আমি বললাম, এক্ষুনি চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন এখানে।

ভাঁটু বলল, মাস্টামশাইকে একটা টাকা চাইল বাসভাড়া লাগবে বলে। গোপগাঁ না কোথায় যাবে।

চিমনি বলল. দিলেন নাকি টাকা ?

দিলাম। বললেন গোপগাঁ যাবেন বোনের বাড়ি। তাই—

চিমনি বিরক্ত হয়ে বলল, আপনারা যেন কী ! চাইল আর দিয়ে দিলেন ? পাগলকে কেউ টাকা দেয় ! ভ্যাট ! দয়া ফলানোর আরও তো জায়গা আছে। দেখুন তো কী বিপদ হল।

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—কেন—কী ব্যাপার ?

চিমনি বলল, এই যে টাকা দিয়েছেন। এবার আর এ তল্লাটে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাসে চেপে কোথায় চলে যাবেন ঠিক নেই ! প্লিজ ! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি জানতাম না যে—

চিমনি হঠাৎ ঘুরে হনহন করে চলে গেল। ভাঁটু চাপা গলায় বলল, বোধকরি বাজারে গেল...বাস-স্টপে। তবে গিয়ে থাকলে এতক্ষণ কতদূরে চলে গেছে বসোবাবু। বাসের তো অভাব নেইকো।...

চিমনির সঙ্গে আবার দেখা হল পরদিন দুপুরে।

হংসধ্বজের সামনে সিগারেট খাইনে। পাশের যে ঘরটাতে আমাকে থাকতে দিয়েছেন, সে-ঘরে ফ্যান নেই। একটা টেবিলফ্যান কিনে দেবেন বলেছেন। রাতের দিকে বেশ হিম পড়ে। দিনেই যা ভ্যাপসা গরম। দুপুরে খাওয়ার পর পেছনের দিকে পেয়ারাতলায় গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। নিচু পাঁচিলের ওপাশে একটা পুকুর। হংসধ্বজেরই পুকুর ওটা। লাল শালুক আর পদ্ম ফুটে আছে সেখানে। একটা পাড়ে আগাছার জঙ্গল, বাকি পাড়গুলোতে কয়েকটা বাড়ি। পেয়ারাতলায় সিগারেট টানছিলাম। ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। হঠাৎ দেখি,চিমনি উল্টোদিকের একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগাছার বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছে। নিচু পাঁচিলটার কাছাকাছি এসে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল এবং একটু হাসল।

বললাম, বাবার খোঁজ পেয়েছিলেন কাল?

চিমনি পাঁচিলের ওপাশে এসে বলল, নাঃ! জানতাম, হাতে টাকা পেয়েছেন—চলে যাবেন।

আমারই দোষ আসলে। আমি ঠিক—

না, না। আপনাকে দোষ দেব কেন? চিমনি মুখে বিষাদরেখা এঁকে বলল।...আপনি কিছু মনে করবেন না প্লিজ! ঝোঁকের মাথায় কাল কী সব বলেছি আপনাকে।

আমার কিছু মনে নেই।

চিমনি পেয়ারাগাছটা দেখতে দেখতে বলল, বাঃ! কত পেয়ারা ধরেছে হাঁসুজ্যাঠার গাছে!

একটু হেসে বললাম, পেড়ে দেব?

থাক। হাঁসুজ্যাঠা কী ভাববে!

কিচ্ছু ভাববেন না।...বলে আমি হাত বাড়িয়ে নিচু গাছের ডাল নুইয়ে একটা ডাঁসা প্রকাণ্ড পেয়ারা পাড়লাম। পাঁচিলের ওপর তাক করে বললাম, লুফে নিতে হবে কিন্তু!

চিমনি বালিকার ভঙ্গীতে হেসে বলল, এই! সত্যি পাড়লেন?

পেয়ারাটা আস্তে ছুঁড়ে দিলে সে আঁচল পেতে লুফে নিল। তারপর বলল, হাঁসুজ্যাঠা কী করছেন?

শুয়ে কাগজ পড়ছেন।

সে তো বাসি কাগজ। চিমনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে কথা বলছিল—যেন

কারুর চোখে পড়ার ভয়। জানেন ? আমাদের ঝাঁপুইতলায় কালকের কাগজ আজ আসে !

জানি। কলকাতা থেকে দূরত্বটা বড্ড বেশি যে !···চিমনির এদিক-ওদিক তাকানো দেখে ফের বললাম, আপনি স্বচ্ছন্দে ওপাশ ঘুরে ভেতরে আসতে পারেন।

চিমনি মাথা দুলিয়ে বলল, উঁহু—পারি না।

কেন ?

আপনি তো ঝাঁপুইতলাকে চেনেন না।

আপনি হাঁসুবাবুর কাছে আসবেন !

তা যাওয়া যায় অবশ্যি।

তাহলে ?

নাঃ, থাক, পরে একদিন আসব।···বলে চিমনি দ্রুত আগাছার বনের ভিতর দিয়ে চলে গেল। তার মাথার পেছনটা যেভাবে নড়ছিল বুঝতে পারছিলাম যে পেয়ারাটা কামড়াতে-কামড়াতে হেঁটে চলেছে।···

বাগদিপাড়ার ধনো আর রনো দুভাই-ই সেন্টারে পড়তে আসে। ধনোর বয়স পঞ্চাশের ওদিকে। লম্বা মানুষ। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে—দৈর্ঘ্যের দরুনই ওই বক্রতা। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। রনোর বয়স প্রায় তার আদ্ধেক। সে শক্তসমর্থ তেজী ধরনের যুবক। দাদাকে পিছনে ফেলে ঈকারে পৌঁছে গেছে। ধনো এখনও ক র কর, ধ র ধর মুখস্থ করে হয়রান। পড়তে পড়তে লালা গড়ায়। সুড়ুৎ করে টেনে দুলে দুলে পড়ে। লম্বা মানুষটা কুঁজো হয়ে দোলে, সবার মাথা ছাড়িয়ে ওর মাথা। সেই মাথায় আবার লম্বা চুল। চুড়ো করে বেঁধে রাখে। হংসধ্বজ বকাবকি করেও চুল ছাঁটাতে পারেননি। বেগতিক দেখলে ফিক করে হেসে বলে, মানত গো মানত ! খোঁড়াপীরের দরগায় মানত রেখেছি। যেদিন ইংরিজিতে এ বি সি ডি পড়ে হেট মেট গেট করে কথা বলব আপিসারবাবুদের মতো, সেদিন আর কাউকে বলতেই হবে না। বাবার দরগায় বনমালী নরসুন্দরকে সঙ্গে করে যেয়ে—ব্যস !

ধনো রোজই বলে, মাস্টোমশাই, একদিন চলুন না আমার সঙ্গে। নদীবিলবাঁওরে ঘুরে আসবেন। আমার মাছধরা দেখবেন। ইদিকে আমার পড়াও অনেকটা এগোবে।

ভাঁটু নিষেধ করে। মাথা খারাপ ? ওর সঙ্গে রোদে-বাতাসে জলেকাদায় ঘুরে

জ্বর-জারি হোক।

ধনো চোখে ঝিলিক তুলে বলে, বড় মজার জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাব মাস্টোমশাই! না গেলে পেত্যয় হবে না—যা কোনোদিন দ্যাখেন নি তাই দেখাব।

কী দেখাবে ধনো? বলো, শুনি।

ধনো বলে, মাস্টোমশাই, কখনও জ্যান্ত পাথর দেখেছেন? শ্বেতপাথর। ঝলমল ঝলমল করে। কালীতলার বাঁওরের কাছে আছে বেরুৎ দ'। সেই দ'য়ে তার বাস। যখন ভেসে ওঠে, চোখ জ্বলে যায় মাস্টোমশাই!

ভাঁটু এবার সায় দেয়, তা আছে বটে শুনেছি। কিন্তু সে কি যখন তখন দেখা দেবে?

ধনো মুখ টিপে হেসে বলে, আর দেখাব একটা ডাক্‌নি।

ডাকিনী দেখাবে? বলো কী ধনো?

ধনো বলে, হুঁউ। জল থেকে উঠে আসবে—একেবারে ওলঙ্গ শরীর। এই বড়ো চুল এলিয়ে হেঁটে আসবে কাশের জঙ্গল ভেঙে। চোখদুটো, মাস্টোমশাই, নীল—নীলবন্ন। গায়ের রঙ পাকা আমের মতো। আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবেন। কিন্তু টুঁ করেছেন কী, নেইকো।

রাতের লেখাপড়ার শেষে চা খাওয়ার পরও কিছু লোক আড্ডা দেয়। হংসধ্বজ তখন চলে গেছেন। সেই সময় এইসব গল্পের আসর দারুণ জমে ওঠে। ধনো বলে এক মেয়েমানুষ মাছের কথা। বুঝতে পারি সে আসলে মৎস্য কন্যার গল্প শোনাচ্ছে। হাঁসমারি বিলের সেই মৎস্যকন্যাকে সে জীবনে একবারই দেখেছিল। তার জালে ধরা দিয়েছিল দয়া করে। আর রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার। ধনো বলে, আবার যদি দেখা পাই--

মুসলমানপাড়ার কাবুল বলে বলো না ধনোদা মাস্টোমশাইকে সেই পরীর গল্পটা? বিলে মাছ ধরছিলে হঠাৎ শমশম করে নেমে এল পরী। আলোয় আলোকিন্নি চাদ্দিক। বলো না ধনোদা!

এরপর অনিবার্যভাবে চলে আসে ভূতপ্রেতের গল্প। রক্তহিমকরা সেই সব গল্প শুনতে শুনতে নিঝুম অন্ধকার রাতে সত্যি আমার গা ছমছম করে। বিশ্বাস এসে যায় অলৌকিকে। থাকতেও তো পারে এই জানাশোনা পৃথিবীর আড়ালে আবডালে এক অলৌকিকে ভরা পৃথিবী। এতদিনে হয়তো সেদিকেই পা বাড়াচ্ছি ক্রমশ।

বাড়ি ফিরতে সত্যি কেমন ভয় করে। হ্যাজাগের আলোর সীমানায় থেকে

চারদিকে তাকাতে তাকাতে পা ফেলি। বারোয়ারিতলায় একরাতে হঠাৎ মাথায় পাকা বটফল পড়ে প্রায় ভিরমি খাই আর কী? এমন কী, আমার ঘরে একলা শুতে ভয় করে। নকুলকে শুতে বলি। নকুলের আবার বউ ছাড়া ঘুম হয় না। বউ একলা থাকবে বলে সে কেটে পড়ে।

একদিন বিকেলে ধনোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। সেদিন রবিবার। ছুটির দিন। ভাঁটু মিস্ত্রি গিয়েছিল পাশের গ্রামে অসুস্থ মেয়েকে দেখতে। হংসধ্বজকে আসল কথাটা বললে বারণ করতেন। তাই বহরমপুর যাচ্ছি বলে এলাম। রাত হয়ে গেলে ফিরতে নাও পারি।

কথামতো হাইওয়েতে বাজার পেরিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়িয়ে ইটখোলার কাছে অশত্থতলায় পৌঁছুলে ধনোর সঙ্গে দেখা হল। ধনো আমার পথ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গায়ে নীল পপলিনের হাতকাটা ফতুয়া, খাটো ধুতির একটা বেড় কোমরে জড়ানো। কাঁধে একটা মোটাসোটা খাদি কাপড়ের নতুন ব্যাগ ঝুলছে। পায়ের কাছে রাখা প্রকাণ্ড একটা মাছ রাখার খালুই আর কালো একটা গুটিয়ে রাখা জাল—ধনোর ভাষায় খ্যাজাল। একটা হেরিকেনও আছে দেখলাম।

মধুর হেসে করজোড়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে বলল, আমার বড় ভাগ্যি। ভেবেছিলাম মাস্টোমশাই কি আসবেন? মুর্খু ছোটলোকেব কথা কি মনে ধরবে?

বললাম, ভনিতা থাক। চলো ধনো, কোথায় যাবে।

ধনো একহাতে খালুই আর জাল অন্যহাতে হেরিকেনটা নিয়ে পা বাড়াল। বলল, সেজেগুজেই এসেছি দেখতে পাচ্ছেন। বা রে! আপনি সঙ্গেতে যাবেন বলে আর আমি ওলঙ্গ হয়ে যাব, তা কি হয়? উদিকে বউও বললে, মাস্টোমশাইকে নিয়ে যাবে—ন্যাংটো হয়ে যেও না। কাচা কাপড়-জামা পরে যাও। গুড়মুড়ি নাও মেলা করে।

ধনো কুঁজো মানুষ। আরও কুঁজো হয়ে যাচ্ছি হাসির চোটে। ইটখোলার পাশ দিয়ে আমরা নদীর বাঁধে গিয়ে উঠলাম। ধনো ঘুরে বলল, টচবাতি এনেছেন তো মাস্টোমশাই?

এনেছি। ব্যাগে আছে।

বাঁধ ধবে কিছুটা চলার পর নদীর বাঁক। বাঁকের মাথায় উঁচু ঢিবির ওপর কয়েকটা বাড়ি দেখিয়ে ধনো বলল, ওই গাঁয়ে যুগীর বাড়ি।

যুগী আবার কে?

গুণিন। ভাঁটু বলেনি আপনাকে ওর কথা?

মনে পড়ছে না।

ধনো হঠাৎ গলা চেপে বলল, তবে যুগী যেমন-তেমন, ওর বউটা সাক্ষাত ডাকনি।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ভাঁটুর কথা। ঝাঁপুইতলা আসার দিন কয়েক পরে একরাত্রে গরমে ঘুম আসছিল না। পেছনের দরজা খুলে সেই পেয়ারা গাছের ওদিকে ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। অন্ধকার রাত। গাছপালায় জোনাকি জ্বলছিল। হঠাৎ দেখি, পুকুরপাড়ে আগাছার জঙ্গলের মাথায় দপ করে একঝলক আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। তারপর আবাব সেই আলো আর স্ফুলিঙ্গ! এবার আবছা দেখলাম, মাথায় একটা আগুনেব পাত্র নিয়ে কে যাচ্ছে। আবার আগুনটা দপ করে উঠতেই চমক লাগল। একজন স্ত্রীলোক—এবং সম্ভবত সে উলঙ্গ। দৌড়ে এসে হংসধ্বজকে ডাকলাম। উনি তখনও জেগে বই পড়ছিলেন। নামিয়ে রেখে বললেন, কী হল! ভয় পেয়েছ নাকি?

ব্যাপারটা বলার পর হংসধ্বজ বলেছিলেন, ও কিছু না। ভয় পাবার কিছু নেই। কোনো ওঝা বা গুণিনের কাণ্ড। ওদিকে একটা শিবমন্দির আছে। সেখানে পুজোটুজো দিতে যাচ্ছে কেউ।

কিন্তু উলঙ্গ হয়ে? তাছাড়া স্পষ্ট দেখলাম মেয়ে।

ভুল দেখেছ। যাও, শুয়ে পড়ো। আর শোনো, গরম লাগলে চলে এস এঘরে। মেঝেয় বিছানা করে শুতে পারো। ফ্যান চলছে। মশা লাগবে না।…

পরে ভাঁটু আমাকে বলেছিলো যুগী বা যোগীর বউয়ের কথা। সে নাকি মেয়েগুণিন। তার কাছে এক ডাকিনী থাকে। ধনোর কথা শুনে কৌতূহল বেড়ে গেল। বললাম, চলো না ধনো। তোমার গুণিনযুগলের সঙ্গে দেখা করে যাই।

ধনো উৎসাহ দেখিয়ে বলল, না গিয়ে ছাড়ব ভেবেছেন? আপনাকে কত কিছু দেখাব বলেই তো সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তাছাড়া, রাতবিরেতে বিলখালে ঘুরবেন। শরীল-বন্ধনও তো করা দরকার।

শরীর-বন্ধন জিনিসটা কি ধনো? হাসতে হাসতে বললাম। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবে নাকি?

ধনো হি হি করে হেসে বলল, আজ্ঞে লা লা!

কয়েক ঘর বসতির এই গ্রামটার নাম ভারি সুন্দর: কাজোলি। ধনোই সব জানাল। এরা ডোম। শ্মশানে মড়াও পোড়ায়, আবার ধামাকুলোও বোনে। কেউ কেউ মাছ ধরে। ইদানীং মেয়েরা ইটখোলাতেও কাজ করতে যায়।

গাবগাছের তলায় বাঁশের মাচান। মাচানে এক বুড়ো বসে তকলি ঘুরিয়ে জালের সুতো বুনছিল। ধনো বলল, কী গো হাঁদুদা ? কেমন বুঝছ ?

হাঁদুবুড়ো তাকিয়ে রইল—কথাটা বুঝতে না পেরেই যেন। ধনো বলল, আমাদের সেন্টারের মাস্টোমশাই। মহা ছিক্কিত পণ্ডিত। পাঁচটা-ছটা পাস। বুঝলে তো ? তার ওপর বেরাহ্মণ ঠাকুর।

বুড়ো এবার করজোড়ে মাথাটা নোয়াল। ঘড়ঘড়ে গলায় ঠাকুর মশাই, বসতে আজ্ঞে হোক বলে সে সসম্ভ্রমে মাচা থেকে নেমে দাঁড়াল। বললাম, আহা ! তুমি বসো !

হাঁদু ডোম কিছুতেই বসল না। অগত্যা আমি মাচানে বসলাম। লোকটার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, কে জানে কেন সে এত ভড়কে গেছে যে হ্যাঁ হুঁ ছাড়া কথাই বলতে রাজি নয়। ধনো জাল, খালুই, হেরিকেন মাচায় রেখে যোগীকে ডাকতে গিয়েছিল। ফিরে এল যোগীর বউকে নিয়ে। তাকে দেখে আমি ভীষণ চমকে গেলাম।

মেয়েটির বয়স পঁচিশ-টচিশের বেশি হতেই পারে না। কালো পাথরে খোদাই করা এক সুন্দর ভাস্কর্য যেন। একটু রোগাটে গড়ন। কিন্তু চুলের ঝাঁপিটি বিশাল। একটু আগে স্নান করেছে সম্ভবত। কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে তার চুল। নাক-মুখের গড়নে সৌন্দর্য আছে। বড় বড় টানা চোখ। কিন্তু চোখের তলায় কালির ছোপ। গলায় সরু লাল পুঁতির মালা। সিঁথিতে দগদগে মারমুখী সিঁদুর। হাতে দু'গাছি লাল প্লাস্টিকের বালা। পরনে লালপেড়ে শাদা শাড়ি। ব্লাউজ নেই।

কিন্তু সব চেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে ওর টানা চোখের অস্বাভাবিক চাউনি। কেমন গা ছমছম করে ওঠে। একটা চাপা অস্বস্তি জাগে। সে হাত জোড় করে মাথাটা একটু নোয়াল। মুখে কোনো হাসি নেই। নির্লিপ্ত উদাসীন ভঙ্গী।

ধনো বলল, যুগী গেছে মাধুনিয়ায় ভূত ছাড়াতে। ফিরতে বোধ করি রাত্তির হবে। বাসে চেপে আসতে হবে তো ! মাস্টোমশাই, এই হল গে যুগীর বউ কমলা। কমলা, আমাদের মাস্টোমশাইয়ের ভালমতন শরীল-বন্ধন করে দে ভাই ! বিলবাঁওরে যাচ্ছে, কুদিস্টি না লাগে যেন।

কমলা বলল, মাস্টারমশাইয়ের দেশ বুঝি সেই কাটোয়া টাউনে ?

একটু অবাক হয়ে বললাম, তুমি কেমন করে জানলে ?

জানি। কমলা ছোট্ট শ্বাস ফেলে ভিজে চুল টেনে নিল পেছন থেকে।

আঙুলে জড়িয়ে বলল, জানি।

আর কী জানো বলো ?

কমলা এতক্ষণে একটু হাসল। হাসিটা সে-রাতে দেখা সেই স্ফুলিঙ্গের মতোই। বলল, আমি কি হাত গুণতে জানি ? তবে আপনার একটা ফাঁড়া আসছে খুব শিগগিরি। একটু সামলে থাকবেন যেন।

হাসতে হাসতে বললাম, ওই তো বেশ গুণতে পারছ !

আমার চোখে চোখ রেখে কমলা বলল, উঁহু। আপনাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে।

আর কী মনে হচ্ছে, বলো !

আপনাকে দেখে দয়ামায়া আছে মনে হয়, কিন্তু আপনি পাষাণ মানুষ।

ধনো খিখি করে হাসতে হাসতে বলল, এইটা ঠিক হল না কমলা। মিলল না। মাস্টোমশাইয়ের মনটা বড্ড নরম।

কমলা বলল, আপনাকে দেখে সাহসী মনে হয়, কিন্তু আপনি খুব ভিতু মানুষ।

হুঁ ! তারপর ?

কমলা আবার একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, আর একদিন সময় করে আসবেন। একটা সিগারেট দিন, খাই !

ওকে একটা সিগারেট দিলাম। দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিতে গিয়ে দেখি, নদীর ধারের হাওয়া আড়ালকরা দুটো হাতের ভেতর থেকে তার দুটো চোখ আমার দিকে। আবার গা ছমছম করে উঠল। এ চাউনি কোনো যুবতীর চোখেব নয়, কোনো মানুষেরও হয়তো নয়। এমন করে কী দেখছে সে ? কেন দেখছে ?

সিগারেটটা সে আস্তে টেনে নদীর দিকে ধোঁয়া উড়িয়ে দিল। লক্ষ্য করলাম ধনো চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখটা বেজায় গম্ভীর। বললাম, কী ধনো ? শরীর-বন্ধনের কী হলো ?

ধনো ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ রে কমলা, মাস্টোমশাইয়ের কী ফাঁড়া আছে বললি। একটু পোষ্কের করে বল না ভাই ! ক্যানে কী, ওনাকে নিয়ে বিলবাঁওড়ে যাচ্ছি। রাত কাটাতে হবে। বল না কিসের ফাঁড়া ?

কমলা মাথা নেড়ে বলল, দূর বুড়ো ! নির্ভয়ে যা না তোর মাস্টারকে নিয়ে। কৈ গো, আসুন এখানে। সোজা হয়ে দাঁড়ান। বন্ধন করে দিই।

হাসি চেপে মাচা থেকে নেমে গেলাম। একটু তফাতে বাড়িগুলোর পেছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে একদল মেয়ে—নানা বয়সের মেয়ে সব। একদঙ্গল

কাচ্চাবাচ্চাও প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে। আমি অ্যাটেনশান ভঙ্গীতে দাঁড়ালে কমলা আমার চারপাশ ঘুরতে থাকল। ক্ষীণ সুরে সে কিছু আওড়াচ্ছিল। কান করে থেকেও বুঝতে পারছিলাম না কী মন্ত্র সে পড়ছে। কিন্তু সুরটা ভারি চমৎকার। কেমন ঘুমঘুম উদাস করা সুর। কয়েকপাক ঘোরার পর সে আমার মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল। তার তর্জনী আমার দুই ভুরুর মধ্যিখানটা স্পর্শ করলে শরীর শিউরে উঠল আমার। আঙুলটা আলতোভাবে আমার নাকের ওপর দিয়ে নামাতে থাকল। ঠোঁট পেরিয়ে গলা ও বুকের মাঝখান দিয়ে নামতে নামতে দু পায়ের ফাঁক দিয়ে মাটি স্পর্শ করল।

মাটিতে আঙুল ঠেকানোর সময় তার বিশাল চুল দু'ভাগ হয়ে দু'পাশে ঝুলে গিয়েছিল। তার পিঠের নিচে এবং দুটো পাশের অনাবৃত অংশ চোখে পড়ছিল আমার। ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এমন কী নিজের অজান্তে ও বিনাপ্রস্তুতিতে হঠকারী লালসা ঝিলিক দিয়েছিল। আমার শরীর হয়তো সেই ক্ষণিক লালসাব তাপেই জ্বলে উঠেছিল। মনে হল আমি কাঁপছি। তারপর আমি সংযত হলাম।

কমলা নাচের ভঙ্গীতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আবার তার ঠোঁটে সেই হাসির একঝলক স্ফুলিঙ্গ দেখলাম। ভুরু কুঁচকে উঁচু থেকে নিচুতে কিছু দেখার মতো তাকিয়ে সে বলল, পুরুষমানুষের এত ভয় থাকতে নেই!

ভয়? কিসের ভয়? জিগ্যেস করতে আমার গলা কেঁপে গেল।

কমলা আমার কথার জবাব দিল না। ধনোর দিকে ঘুরে বলল, যাও ধনোদা! তোমার মাস্টারমশাইয়ের 'বন্ধন' করে দিলাম। আর যমেও ছোঁবার সাহস পাবে না। শুধু নিজের সাহস থাকলেই হল।

ধনো খুশি হয়ে বলল, ব্যস! ব্যস! তবে আর কী চাই! কমলা রে! ভোরবেলা যাবার সময় দাঁড়িয়ে থাকিস যেন। মাছ দিয়ে যাব।

কমলা বলল, যদি না পাও!

ধনো ভড়কে গিয়ে বলল, ক্যানে? তেমন কিছু দেখছিস নাকি রে?

নাঃ! বলে কমলা সেই সিগারেটটা টানতে টানতে দ্রুত চলে গেল। আর পিছু ফিরল না।

ধনো বলল, আসুন মাস্টোমশাই! বাঁওরে যেয়ে যেন বেলা ডোবে।

আমরা কয়েক পা এগিয়ে গেছি, সেই সময় কানে এল, হাঁদু বুড়ো বলে উঠল, ঢঙ মাগীর! ঘুরে দেখলাম সে মাচায় উঠে উরুর কাপড় তুলে তকলিটার পাক

খাইয়ে নিচ্ছে। মুখটা বেঁকেচুরে আছে।...

ধনো বকের মতো ঠ্যাং ফেলে হাঁটছিল। পরের বাঁকে বাঁধটা নদী থেকে দূরে সরতে সরতে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। ডাইনে যতদূর চোখ যায়, ধানক্ষেত। বাঁদিকে কাশবনের ভেতর ঝাড়বাতির লম্বাটে কাচের টুকরোর মতো নদীর একেকটা অংশ শেষবেলার গাঢ় হলুদ আলোয় ঝিকমিক করছে। শাদা কাশফুলের ওপর বনচড়ুয়েব ঝাঁক ফরফর করে উড়ে গেল। কোথায় কী এক পাখি ডাকছিল ট্রি ট্রি ট্রি...ট্রি ট্রি ট্রি। ধনো বলল, ওই শুনুন হট্টিটি পাখির ডাক। আর ওই যে দূরে চকমকির বিল। ওই বিলে নাইতে আসে বিস্তর পরী। আর ওই দেখুন মাস্টোমশাই ঝুপসি হয়ে হেলে আছে লাকুড় গাছ। তার নামুতে কালীতলার দ'! আর ওই দেখুন হেজলের জঙ্গলের ফাঁকে হরিমতীর বাঁওড়। হরিমতী কে ছিল জানেন? বোষ্টুমী। ভাঁটু মিস্তিরির সম্পক্কেতে এক দাদা ছিল কিঙ্কর মিস্তিরি। কিঙ্কর বেড়াতে গিয়েছিল বোরেগিতলায় বোষ্টুম-বোষ্টুমীর মেলায়। এঃ হে হে! কাকে কী বলছি? বোরোগিতলা তো আপনাদের কাটোয়াতল্লাটে। তাই না মাস্টোমশাই?

তুমি গপ্পটা বলো, ধনো!

বলি। বলে সে পা তুলে একটা কাঁটা উপড়ে ফেলে দিল। সাবধানে পা ফেলতে পরামর্শ দিয়ে হরিমতী বোষ্টুমীর গপ্পটা শুরু করল ফের।...কিংকর বোরেগীতলার মেলায় গিয়ে হরিমতীর পাল্লায় পড়ে বোষ্টম হয়েছিল। জাতব্যবসা ছেড়েছিল। খঞ্জনি বাজিয়ে শেষে ভিক্ষে করে বেড়াত গান গেয়ে। শেষে হরিমতীর মরণ হল। তখন কে তার মড়া ছোঁবে? কিংকর তার পায়ে বিচুলির দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। পেছন-পেছন মজা দেখতে দেখতে চলেছে একশো লোক। যেখানে মড়া ফেলতে যায়, লোকে বাধা দেয়। শেষে ওই বাঁওড়ে—

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে ধনো ঘুরল আমার দিকে। জিগ্যেস করল, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে নাকি?

বললুম, না। ভাল লাগছে।

মাথার ওপর দিনশেষের ছাইরঙা আকাশে শনশন করে ভেসে গেল বুনোহাঁসের একটা বড় ঝাঁক। মুখ তুলে পাখির ঝাঁকটা দেখে নিল ধনো। ওর মুখে এখন আশ্চর্য প্রশান্তি। বলল, কেবলই আসতে শুরু করেছে। ওই দেখুন চকচকির বিলের দিকে বেঁকে গেল ধনুকবাঁকা হয়ে। দেখুন, দেখুন

মাস্টোমশাই ! এমন জিনিস কখনও দেখেননি।

বাচ্চা ছেলের মতো হাসছিল ধনো। তাকিয়ে দেখি দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে এক কালো ধনুক। সেই অলীক ধনুক নেমে যাচ্ছে ক্রমশ। রঙীন কয়েক টুকবো মেঘের শিয়রে লালচে আভা। তার গা বেয়ে কালো ধনুকেব পতন। অবাক লাগে।

হঠাৎ আমার মনে হল, এই মানুষটার চেয়ে যেন পৃথিবীতে এ মুহূর্তে আর কেউ সুখী নয়। ওর দারিদ্র, ওর লেখাপড়া শেখার চেষ্টা, ওর জাতিবর্ণপেশা—সবকিছুই এই পরিব্যাপ্ত বিশালতার কাছে ভীষণ তুচ্ছ হয়ে গেছে। ওর কণ্ঠস্বরে ঘোষিত হচ্ছে ভিন্ন এক পৃথিবীর বার্তা। সে পৃথিবী খুব আদিম, গভীর বহস্যে ভরা এবং সে সেখানে সম্রাট। সম্রাটের মতো পা ফেলে সে হাঁটছে। একজন বহিরাগতকে মুহুর্মুহু পাঠ দিচ্ছে সেই পৃথিবীর। অ আ ক খ করে শেখাচ্ছে এখানকার আদিম সব হরফ। আমরা এখন কাশবনের ভেতর পায়ে চলা রাস্তায় হাঁটছিলাম। পায়ের চাপে সবুজ কাশ বুক চিতিয়ে পড়ে গেছে। রবারসোলের চপ্পলের তলায় তার মনোরম কোমলতা। আমার হঠাৎ মনে হল, এই পৃথিবীকে জুতো মারার মতো নোংরা কাজ করে চলেছি। এখানে এরা চায় মুক্ত নগ্নতা। এই কোমল কাশ, নরম মাটি চায় আমাব রক্তমাংসময় সত্তাটাকে ছুঁতে। দুপাশ থেকে তারা আমাকে স্পর্শ করছে। আমার পোশাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে মুঠোমুঠো কাশফুলের রেণু। লালপোকা নীলপোকারা আমার বুকে এসে বসছে। প্রজাপতি ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার চুল। কিন্তু চপ্পল খুলতে গেলে ধনো টের পেয়ে হাঁ হাঁ করে উঠলো।...উঁহু হু! পা কেটে রক্তারক্তি হবে মাস্টোমশাই। ও তো আমার পা নয়, এই দেখুন আমার পা। সে হাসতে হাসতে তার পায়ের তলা দেখাল। হাজাধরা ফাটা পা। পায়ের তলা দুধেব মতো শাদা। থেবড়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা আঙুল। সারাজীবন এই পৃথিবীতে সে হেঁটেছে। রাতের পর রাত জলে ডুবে থেকেছে তার পা দুটো। এখানে হাঁটাচলার জন্য ওইরকম পা থাকা দরকার। ধনো তার পায়ের জন্য গর্বিত।

আবার নদীকে পাশে পেলাম। সামনে ঝুপসি প্রকাণ্ড সেই লাকুড় গাছ। ঝুঁকে আছে নদীর ওপর। দুটো সারস মগডালে বসে আছে, দৃষ্টি দূরের দিকে। একঝাঁক শাদা বক অলীক ফুলের মতো থরে-বিথরে ফুটে আছে ডালপালায়। এতক্ষণে সূর্য ডুবেছে কাশবনের নিচে। হাল্কা নরম গোলাপি আভার ওপর ঘননীল কুয়াশার পোঁচ পড়েছে। কুয়াশা দূরে ও কাছে রোদে শুকোতে দেওয়া কাপড়ের মতো ঝুলছে। এখানে বাঁওর। নদীর বাঁকের মুখে অনেক দূর অব্দি

গভীর জল। লাকুড়গাছের তলায় একটা শেকড়ের ওপর বসতেই ধনো বাধা দিল, পাখাপাখালিতে হেগে দেবে। দেখছেন না গাছটার ডালের অবস্থা। যেন চুন মাখিয়ে রেখেছে।

তক্ষুণি উঠে এলাম। একটু তফাতে ঢালু ঘাসজমির ওপর বসলাম। ধনো সামান্য দূরে একটা বাঁশবন দেখিয়ে বলল, ওই দেখুন তোরাপ হাজির বাঁশঝাড়। লোকটা ভাল। রাত কাটানোর ছাউনি করতে হবে। একখানা বাঁশ কেটে আনি। বসুন।

সে তার ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট দা বের করে নিয়ে লম্বা পায়ে বাঁশবনটার দিকে এগিয়ে গেল। আমি নদী দেখছিলাম। হঠাৎ ধনো আমাকে চেঁচিয়ে ডাকল। দেখে যান মাস্টোমশাই, দেখে যান!

সে একটা ঝোপের ভেতর কিছু দেখছিল। তার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে চমকে উঠলাম। শরীর কেঁপে উঠল। ঝোপের ভেতর ঘন ছায়ায় একটা সরু ডালে জড়িয়ে আছে চিত্রবিচিত্র একটা সাপ। দম আটকানো গলায় বললাম, সাপটা মারো ধনো!

ধনো হাসল। ...অবোলা জীব মাস্টোমশাই। থাক। ক্ষেতি তো করেনি।

কী আশ্চর্য! সাপটা নিশ্চয় বিষাক্ত। ওটা এখনই মেরে ফেলা উচিত।

ধনো খি খি করে হাসতে লাগল। আজ্ঞে না না। বাঁকরাজের বাচ্চা। দুটো মুখ ওদের। ওই দেখুন!

দুমুখো সাপ হয় না, ধনো। ওটা মেরে ফেলো।

ধনো আমার কথা গ্রাহ্য করল না। তারিফ করার ভঙ্গীতে সাপটা দেখতে দেখতে বলল, আহা! বড় সোন্দর সাপ। ওর মা-বাবা বোধ করি এই তল্লাটেই কোথাও আছে। আহা রে!

রাগ করে বললাম, যখন কামড়ে দেবে, আহা রে বলা বেরিয়ে যাবে তোমার!

ধনো জোরে মাথা নেড়ে বলল, মাস্টোমশাই, বাঘের দেখা সাপের লেখা। নদী-খাল-বিলে চরে চুল পাকিয়ে ফেললাম গো! কপালে লেখা থাকলে খণ্ডায় সাধ্যি কার? যান, যেয়ে বসুন আরাম করে। আমি বাঁশ কেটে আনি হাজিসায়েবের ঝাড় থেকে।

এরপর আমার অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ মাঠে মারা গেল। পা ফেলতে গিয়ে চমকে উঠি। দিনশেষের ছায়ায় ঢাকা পৃথিবী জুড়ে জলেমাটিতে সবখানে কিলবিল করে অসংখ্য রঙীন সাপ। এখনই পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ভাবি, ধনো ফিরে এলেই একটা অছিলা করে কেটে পড়ব। কিন্তু সন্ধ্যা এগিয়ে

আসছে। এতটা পথ কাশবনের ভেতর দিয়ে ফেরার কথা ভাবতেই গা হিম হয়ে যায়। নিজের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর খাপ্পা হয়ে বসে রইলাম। টর্চ বের করে বারবার চার পাশে আলো ফেলছিলাম। কিন্তু এখনও দিনেব আলো ফুরিয়ে যায়নি। টর্চের আলো হাস্যকর হয়ে পড়ছিল।

তারপর মনে পড়ল কমলা ডোমনি আমার 'শরীর-বন্ধন' করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে আশ্চর্যভাবে তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল। নির্জন নদীর ধারে এই আদিম পৃথিবীতে সেই অদ্ভুত বিশ্বাসটুকু ছাড়া আমি সত্যি অসহায়।

ধনো এল একটা সরু বাঁশ কেটে নিয়ে। সেটাকে চাব টুকরো করে ঝটপট চাবকোণে পুঁতে ফেলল। তারপর তাব ব্যাগের ভেতর থেকে বের করল দুটো চট। বলল, এবার দয়া করে একটু গা তুলুন আজ্ঞে। একটা দিক ধরুন।

একটা চটের চারকোণায় দড়ি বাঁধা ছিল। চারটে বাঁশের খুটিতে বেঁধে দিলে চমৎকার একটা ছাউনি হল। কতকটা তাঁবুর মতো। তার মেঝেয় একগাদা কাশ কেটে এনে বিছিয়ে দিল ধনো। বলল, উত্তুম হয়েছে। মাথায় লিওর পড়বে না।

সে দ্বিতীয় চটটাকে মেঝেয় বিছিয়ে দিয়ে একবাব বসে দেখল। আনন্দে সে ক্রমাগত হাসছিল। হাসতে হাসতে লণ্ঠনটা জ্বেলে নিল। সামনের একটা খুঁটির মাথায় ঝুলিয়ে দিল সেটা। তারপর ফতুযার পকেট থেকে বিড়ির কৌটো বের করে বিড়ি ধরাল। বিড়ি টানতে টানতে বলল, আর একটুখানি মুখ-আঁধারি হলে বেরুব।

অন্ধকার শিগগির এসে গেল। তারপর চারদিক থেকে শুধু পোকামাকড়ের ডাক। একবার দূরে শেয়াল ডাকল। ধনো কান কবে শুনে বলল, কোথায় মড়া দেখেছে। নাগাল পাচ্ছে না হতভাগারা। বোধ করি মাঝনদীতে ভেসে যাচ্ছে।

জিগ্যেস করলাম, কেমন করে বুঝলে?

বুঝতে পারি।...অবিকল কমলার ভঙ্গীতে বলল ধনো। তারপর সে ফতুয়াটা খুলে ফেলল। ধুতি খুলে একটা গামছা পরে নিল। বলল, কষ্ট করে একটু আসুন। পয়লা খ্যা সাইতের খ্যা। আপনি ঠাকুরমশাই। জালের সুতোটা ছুঁয়ে একটুখানি আশীর্বাদ দেবেন। বাস!

টর্চের আলো ফেলছি দেখে সে বলল, উঁহু হুঁ। আপনি দয়া করে নিজের পায়ের সামনে ফেলুন আলো। নৈলে আমার অসুবিধে।

লাকুড়গাছটা পেরিয়ে গিয়ে সে অন্ধকার নদীর একেবারে কিনারায় দাঁড়াল। জালের সুতোটা ছুঁয়ে বললাম, আশীর্বাদ করেছি, ধনো। ধনো জাল ফেলল। অন্ধকার নদীতে অদ্ভুত একটা ছলছলাৎ শব্দ হল। নদী যেন চমকে উঠে

আমাদের দিকে তাকাল। আকাশভরা নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব মন্থর স্রোতে ঝিলমিল করতে থাকল। মনে হল, নদীও হাসতে জানে।

কিছুক্ষণ পরে জাল গুটোতে শুরু করল ধনো। গুটোনো হয়ে গেলে কিনারা থেকে সরে এসে ঘাসে জালটা নামিয়ে ব্যস্ত ভাবে বলল, টর্চবাত্তি জ্বালুন দিকিনি!

টর্চের আলোয় কালো জালের গায়ে রুপোর ঝলমলানি দেখে ধনো খি খি করে হাসতে লাগল। ,..আপনার সাইত মাস্টোমশাই। ছুইমাছের একটা ঝাঁক লুঠ করেছি। বড় সোয়াদ মাছগুলোনের। আহা হা!

জাল খুলে ছটফটে রূপোর কাঠির মতো মাছগুলো সে একটা-একটা করে খালুইতে ভরল। জালের ভেতর থেকে খড়কুটো আবর্জনা ছাড়িয়ে ফেলল। তখন বললাম, এটাই কি কালীতলার দহ?

আজ্ঞে।

এখানেই জ্যান্ত শ্বেতপাথর থাকে?

চুপ চুপ। বলতে নেই।

তুমি দেখাবে বলেছিলে।

দেখাব, দেখাব। সবুর করুন। ধনো আশ্বস্ত করল।...

আরও খানিকটা এগিয়ে আরও বারকয়েক জাল ফেলে আরও কিছু মাছ ধরার পর ধনো বলল, চলুন এবারে। খাওয়াটা সেরে নিই। বউ একগাদা গুড়মুড়ি দিয়েছে। কিন্তু একটা কথা—ভয়ে বলি, কী নিভ্ভয়ে বলি?

নির্ভয়ে বলো।

আমাদের ছোঁয়া বটে, তবে কিনা শুকনো জিনিসে দোষ নেইকো। খালি পেটে রাত কাটাবেন?

বুঝতে পেরে বললাম, আমি জাত-টাত মানি না ধনো।

ধনো হাঁটতে হাঁটতে বলল, না মানলে কি চলে? মানতেও হবে। তবে কিনা—

হাসতে হাসতে বললাম, শাস্ত্রে আছে বিদেশে নিয়ম নাস্তি।

আজ্ঞে, আজ্ঞে! তবে আর কথা কী? ধনো খুব উৎসাহে হাঁটতে থাকল।

এতক্ষণে টের পেলাম, প্রচণ্ড শিশির জমেছে। ছাউনি এরি মধ্যে ভিজে সপসপ করছে। কাশের ওপর বিছানো চটও স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। এমন কী, স্তব্ধতার ভেতর গাছপালা ঝোপঝাড় থেকে শিশির চুইয়ে পড়ার টুপটুপ শব্দও শুনতে পচ্ছিলাম।

গুড়মুড়ির স্বাদ অপূর্ব লাগছিল। রুমালভর্তি গুড়মুড়ি চিবুতে চিবুতে মনে হচ্ছিল হয়তো এই আদিম পৃথিবীতে সব কিছুই এমনি সুস্বাদু। ব্যাগ থেকে এনামেলেব ঘটি বের করে নদীর জল আনল ধনো। জলটাও মনে হল সুস্বাদু। ধনো মনে করিয়ে দিল. আমাদের এই নদী যেয়ে পড়েছে একেবারে মা গঙ্গার বুকে। বুঝলাম সে বলতে চাইছে, মড়া ভেসে গেলেও এই জল গঙ্গাকে ছুঁয়ে আছে বলে এই জলও পবিত্র।

সে মৃদু স্বরে এ নদীর গল্প বলতে থাকল। কবে একদিন গঙ্গা থেকে উজান স্রোতে এই নদী বেয়ে এসেছিলেন এক মড়া। রীতিমতো এসেছিলেন। কাজলির ঘাটে তেনাকে আটকাল এক গুণিন। সে কি যোগী ? মাথাখারাপ ! তখন তার কর্তাবাবারও জন্ম হয়নি। তো গুণিন যখন মড়াকে আটকালে, তখন ঘাটে ভিড় করে সবাই দেখতে গেল। অবাক কাণ্ড ! সেই মড়ার গায়ে চাঁপাফুলের বাস ছুটছে। মউমউ করছে 'সৌগন্ধে' চারদিক। তল্লাটের লোক ছুটে এল। সে কী গন্ধ ! সে কী সুবাস ! ঘাটে ঢোল বাজে। কাঁসি বাজে। শাঁখ বাজে। উলু দেয় নারীসকল। গুণিন একবুক জলে দাঁড়িয়ে মড়াকে ধরে আছে। বলছে, যেই হও তুমি, চোখ খোলো। সাতদিন সাতরাত পরে মড়া চোখ খুললেন। অমনি পৃথিবী আলো হয়ে গেল। সে কী আলো ! সে কী ঝলমলানি ! সে কী 'সৌগন্ধ' !

ধনো মুখ উঁচু করে যেন সুপ্রাচীন এক অলৌকিক মড়ার চাঁপাফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছিল। চাপা শ্বাস ফেলে হঠাৎ বলল, ওই বুঝি জোসনা উঠলেন।

পিছনে তাকিয়ে দেখি, হিজলের জঙ্গলের মাথায় ফিকে হলুদ ছটা। কৃষ্ণপক্ষেব ভাঙা এক চিলতে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। দূরে কোথায় সেই হট্টিটি পাখিটা ডাকছে টি টি টি···টি টি টি। ধীরে ফিকে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছিল মাকড়সার জালের মতো জলে , কাশবনে, বৃক্ষলতায়। ধনোর স্তব্ধতা দেখে মনে হল. এখনই হয়তো দহের জলে শ্বেতপাথবের ভেসে ওঠার কিংবা নক্ষত্রলোক থেকে পরীদের নাইতে আসার সময় হয়েছে।

চাপা গলায় সে বলল. আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। একটুখানি শুয়ে নিন। ঘুম হয়তো পাবে না। দুচাবটে মশাতেও জ্বালাতন করবে। তবু—

বললাম, তুমি জাল ফেলতে যাবে না কি ?

একটু পরে যাব। জোসনা একটু চেকন হোক। বাঁওরের উদিকে যাব।

আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

না, না। বড্ড কাদা হবে। আপনি একটু গড়িয়ে নিন।···

ঠিক ঘুম নয় নিছক আচ্ছন্নতা সেটা ক্লান্তি আর এরকম অনভ্যস্ত হাঁটাচলার জন্যই। হিমে গা শিরশির করছিল জামাপ্যান্ট স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছিল। চোখ খুলে সামনে নিচে জলের ওপর জ্যোৎস্না ঝিলমিল করতে দেখলাম। তারপরই একটা প্যাঁচা লাকুর গাছটা থেকে বিকট ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করতে করতে নদীর ওপারে চলে গেল। তখন ভীষণ চমকে উঠে বসলাম।

তারপর কেন কে জানে ভয় পেলাম। নদীতে মড়া ভেসে যাওয়ার গল্পটা মনে পড়ল। ফিকে হলুদ জ্যোৎস্নায় নিঝুম বৃক্ষলতা আর কাশবনের ভেতর কি আজ রাতে চাঁপাফুলের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে কোনো মৃতদেহ চলাফেরা করছে ?

হঠাৎ সত্যিই একটা সুগন্ধ ভেসে এল কোত্থেকে। থরথর করে কেঁপে উঠলাম। আর একটু হলেই চিৎকার করে ধনোকে ডেকে ফেলতাম। লাকুড় গাছটার দিক থেকে ছায়া পেরিয়ে কেউ এগিয়ে আসছিল। ভাবলাম ধনো। তাই আর চেঁচানো হল না। আস্তে বললাম, ধনো ?

না, আমি।

ছায়া পার হয়ে জ্যোৎস্নায় চলে এসেছে সে। কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে বললাম, কে ?

ভয় পেলেন নাকি ? আমি মানুষ।

ঝটপট টর্চ জ্বেলে দেখি কমলা ডোমনি। মুখ দুহাতে ঢেকে বলল, আঃ ! কী হচ্ছে ? টর্চ নিভিয়ে দিলাম। সে কাছে এসে শিশিরভেজা ঘাসে বসে পড়ল। বললাম, তুমি এখানে ?

মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম।

এখানে মন্দির আছে নাকি ?

আছে তো মাকালীর মন্দির—বাঁওরের মাথায়।

এত রাতে এই বিলবাদাড়ে তুমি পুজো দিতে এসেছ ! নিশ্চয় তোমার স্বামীও এসেছে ?

কমলা মাথা নেড়ে বলল, নাঃ। সে খবর পাঠিয়েছে এখনও একটা দিন থাকবে গোপগাঁয়ে।

আশ্চর্য তো ! আলো নেই সঙ্গে—কীভাবে এলে ?

কমলার দাঁতে জ্যোৎস্না ঝিলমিল করল।...আমি রাতচরানি জানেন না ? আমার সব কাজ রাতের বেলাতেই।

ধনোর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

হ্যাঁ। মিনসে বাঁওরে ঘুরছে। কৈ, একটা সিগারেট দিন।

সিগারেট দিলাম। ধরিয়ে দেবার সময় দেখলাম, সে বিকেলের মতোই দুহাতের ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখছে। বললাম, আশ্চর্য তোমার সাহস! এভাবে একা এত রাতে এতদূরে·

কমলা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, যার যখন কাজ পড়ে, তাকে সেখানে তখন যেতে হয়। ওই যে ধনোদা বাঁওরে মাছ ধরে বেড়াচ্ছে, সেইরকম।

একটু হেসে বললাম, তুমি তো মেয়ে।

মেয়েরা রাতে বিলেখালে ঘোরে না বুঝি? গিয়ে দেখুন গে চকচকির বিলের ধারে। কত মেয়ে জাল পেতে মাছ ধরছে। রাতের বেলা মাছ ওঠে বলেই তো!

তুমি কী মাছ ধরো, কমলা? বলো, শুনি।

কমলা নদীর দিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে বলল, বলতে মানা আছে।

সে নদীর দিকে ঘুরে রইল। তার কানের দুলে জ্যোৎস্না চকচক করছিল। বিশাল চুলগুলো সে আলতোভাবে বেঁধে রেখেছে। ঘাড়ে ঝুলে আছে। গায়ে ব্লাউজ দেখেছি টর্চের আলোয়। সেই লালপেড়ে সাদা শাড়িটাই পরে আছে। একটু পরে বললাম, কী সেন্ট মেখেছ?

কমলা ঘুরে বলল, পাচ্ছেন বুঝি?

দূর থেকেই পাচ্ছিলাম।

ভালো না গন্ধটা?

দারুণ। আচ্ছা কমলা?

কী?

তুমি সেদিন রাতে হাঁসুবাবুর বাড়ির পেছনের জঙ্গল দিয়ে—

কমলা মাথা নড়ে বসল। বলল, ও ম্মা! সে কী কথা?

আমি দেখেছিলাম।

তাহলে তো—

সে হঠাৎ থামলে বললাম, তাহলে কী?

সত্যি বলছেন দেখেছিলেন? তার কণ্ঠস্বরে একটা চাপা মিনতি যেন। ফের বলল, সত্যি বলছেন?

সত্যিই। তোমার মাথায় একটা ধুপচি ছিল।

কমলা ফুঁসে ওঠার ভঙ্গিতে বলল, কেমন করে জানলেন সে আমি? কে বলল শুনি?

পরে ভাঁটুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে তোমার কথাই বলল।

কমলা ভাবি নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকল। একটু পরে বললাম, তাহলে তো বলে চুপ করলে। কী তাহলে তো?

সে সিগারেটে জোরে একটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল নদীর জলে। শব্দ করে ধোঁয়াগুলো উগরে দিল। তারপর হাই তোলার ভঙ্গী করে বলল, কৈ, সকন। একটু শুয়ে নিই। পাখপাখালি ডাকার আগে ফিরে যেতে হবে।

সে আমার পাশ দিয়ে চটের ছাউনির তলায় কাত হয়ে শুতে এল এবং আমার শরীরে সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ল বিকেলের সেই ক্ষণিক লালসা বিরাট একটা ঢেউয়ের মতো, গ্রাম থেকে দূরে মধ্যরাতে এই জনহীন আদিম পৃথিবীতে এটাই ভীষণ স্বাভাবিক ছিল। স্বাভাবিক ছিল এই হঠকারী স্বাধীনতার তুমুল আক্রমণ, যে স্বাধীনতা একান্ত প্রাকৃতিক এবং যে স্বাধীনতায় ওই নদী বয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ছড়াচ্ছে জ্যোৎস্না, শিশির ঝরছে ধারাবাহিক, নীল কুয়াশা এখন যার আবেগের মতো ফুলে উঠেছে বৃক্ষলতায়।

এ এক প্রচণ্ড মুহূর্ত। ওর সেই তীব্র সুগন্ধের ঝাপটানি আর আমার শরীরের খুব কাছে চলে আসা ওর শরীর আমাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতার দিকে টানতে থাকল। কিন্তু ঠিক তখনই হঠাৎ দূরে ধনোর চিৎকার শুনতে পেলাম, মাস্টোমশাই! মাস্টোমশাই! মাস্টোমশাই গো-ও-ও! কমলা চমকে উঠে বলল, কী হল ধনোদার? চিৎকারটা আর্তনাদের মতো। ক্রমশ কাছে আসছিল। ওগো মাস্টোমশাই: মাস্টোমশাই গো-ও-! কমলা উঠে দাঁড়াল। আমিও বেরিয়ে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম, কী হয়েছে ধনো?

ধনোর কালো মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে ভাঙা গলায় ক্রমাগত মাস্টোমশাই বলে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে আসছে। টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলাম দ্রুত। কমলাও আমার সঙ্গে এল। লাকুড গাছটার তলায় এসে ধনো আছড়ে পড়ল। দুহাতে একটা পায়ের গোড়ালি চেপে ধরে বলল, আমাকে ডংশেছে গো মাস্টোমশাই। কালে ডংশে দিয়েছে গো!

কমলা চেঁচিয়ে উঠল, পোকায় কেটেছে?

ধনো কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাকে বাঁচা ভাই কমলা। চক্কর তুলে ডংশেছে। আমি মরে গেলে আমার ছেলেমেয়েগুলান না খেয়ে মরে যাবে রে!

সে কপাল চাপড়ে বিলাপ করতে থাকল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কমলা তার শাড়ির একটা পাড় ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর অদ্ভুত কৌশলে দাঁত দিয়ে কেটে নিল। পাড়টা সে ধনোর পায়ে বেঁধে ফেলল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, দ্যাখোদিকিনি! এই বনবাদাড়ে

এখন কী করি ! গাঁয়েঘরে হলে চিন্তা ছিল না।

আরও খানিকটা পাড় ছিঁড়ে সে আরও একটা বাঁধন দিল উরুর ওপর। ধনো কনুইভর করে চিত হয়ে আছে। তার চুড়োবাঁধা চুল খসে গিয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। সে সুর ধরে বিলাপ করছে। জাল খালুই সব ফেলে দৌড়ে এসেছে সে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছি তাকে।

কমলা আমাকে ধমক দিয়ে বলল, আ মোলো ! হেরিকেনটা নিয়ে আসবেন তো ?

দুঃস্বপ্নের মধ্যে হাঁটার মতো করে হেরিকেনটা নিয়ে এলাম। ধনো এবাব হাঁ করে আছে। তার কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। কমলা সুর ধরে মন্ত্র পডতে শুরু করেছিল। হঠাৎ থেমে বলল, মাস্টাবমশাই ! শিগগির আমাদের গাঁয়ে চলে যান। আমার দেওর আছে, মুকুন্দ নাম। তাকে গিয়ে বলুন এই এই ব্যাপার। বারান্দার তাকে আমাব একটা বটুয়া আছে। তার মধ্যে বিষপাথর আছে। ওষুধ আছে। মুকুন্দকে বলবেন, শাদা জড়িটা এক্ষুনি শিলে বেটে গেলাসে করে যেন নিয়ে আসে। শিগগির যান দিকিনি !

ওর তাড়াতেই পা বাড়ালাম। কিন্তু আসলে আমাব যেতে ইচ্ছে কবছিল না। একমাইল কাশবনের পথে ছুটে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারছিলাম না। পরে ভেবে অবাক হয়েছিলাম, আমি কী স্বার্থপর আর নির্বিকারভাবে আত্মসুখী ! আমি যদি ওদেবই কেউ হতাম, আমার প্রতিক্রিয়াটা হত একেবারে উল্টো। ভেতর-ভেতব অমন বিরক্ত হতাম না। একটা সাধারণ জৈবিক সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে অবচেতনায় জান্তব ক্ষোভ গরগর কবত না। আমি পুরোপুরি মানবিক হয়ে উঠতাম। সাপের ভয় পরোয়া না কবে ছুটে যেতাম মাইলের পর মাইল জলকাদা বনবাদাড় পেরিয়ে ধনোর সঞ্জীবনী আনতে !

অথচ সে মুহূর্তে কমলার ওই স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত মানবিক সাড়া দেওয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে হুকুমজারি বলে মনে হচ্ছিল। বলতে ইচ্ছে করছিল কমলা, তুমি জান না আমার মতো মানুষের পক্ষে এই ছোটাছুটিটা যেমন ক্লান্তিকর, তেমনি বিপজ্জনকও হতে পারে ? আমি তো তোমাদের মতো মাঠঘাট বনেজঙ্গলে কখনও ঘুরিনি। এ জীবন আমার সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। আর কমলা, একটা চরম সুখের মুহূর্ত থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়ে যাওয়ায় আমার ভীষণ রাগ হয়েছে। ধনো নামে একজন আদিম সামান্য মানুষের মৃত্যু তো এভাবেই হওয়া স্বাভাবিক। ধনোরা এমনি কবেই মারা পড়ে। সেজন্য আমি কী করতে পারি ?

কয়েক পা এগিয়ে তারপর ঘুরে বললাম, বারান্দার তাকে কী আছে বললে

যেন ?

কমলার চিৎকার গ্রাম্য মেয়েদের অশালীন কণ্ঠস্বরকে প্রতিধ্বনিত করল। লেখাপড়াজানা লোককে কবার বলতে হবে ? বিষপাথর আর সাদা জড়ি।

জড়ি তো ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানুষ না কী আপনি !...আমাকে ধিক্কার দিয়ে সে এবার জোরে সুর ধরে মন্ত্র পড়তে লাগল। সুরটা মিষ্টিই। টর্চের সুইচটা টিপে রেখে দ্রুত হাঁটবার চেষ্টা করছিলাম। জ্যোৎস্নায় আলোটা তত উজ্জ্বল হচ্ছিল না। যতবার পা ফেলি, ততবার মনে হয় এই বুঝি ফোঁস করে উঠল বিষাক্ত সাপ প্রকাণ্ড ফণা তুলে।

এই আতঙ্কটাই শেষপর্যন্ত আমাকে দৌড়তে বাধ্য করল। কোথায় যেন পড়েছিলাম, জোরে দৌড়লে বিষাক্ত সাপ মানুষকে প্রাণে মেরে ফেলার মতো বিষ ঢালতে পারে না। কারণ সময় পায় না পুরো বিষটা ঢেলে দেবার।

আসার সময় মনে হয়েছিল, শিগগির নদীর দহে পৌঁছে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাওযার সময় মনে হচ্ছিল, এই কাশবনের শেষ নেই। আমার সারা জীবনটাই চলে যাবে দৌড়ুতে দৌড়ুতে। এই বিপজ্জনক, স্যাঁৎসেঁতে, কর্কশ একটা জঙ্গল পেরুতে আর পারবই না। পায়ে কিছু ঠেকলেই আঁতকে উঠছিলাম। পস্তানি হচ্ছিল, কেন আমার একজোড়া গামবুট নেই ? পাড়াগাঁয়ে কাটাতে হলে একটা গামবুট কিনে ফেলতেই হবে।

বাঁধে পৌঁছে মনে হল, দিক ভুল হচ্ছে না তো ? ভাঁটু বলেছিল মাঠঘাট বিলবাদাড়ে রাতবিরেতে ভূতেরা দিক ভুল করিয়ে মানুষকে শেষে মেরে ফ্যালে। থমকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম। বাঁধটা বাঁক নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে। স্মরণ করছিলাম কোনদিকে থেকে এসেছি। ডাইনে তাকিয়ে নদীর আভাস পাওয়া গেল। আমাকে এবার উত্তরে যেতে হবে। আর সেই সময় উত্তরে গাঢ় ধূসরতার ভেতর দূরের কুকুরের ডাক ভেসে এল। ওই তাহলে কাজলি।

গাবগাছের তলায় মাচাটার কাছে যেতেই প্রচণ্ডভাবে কুকুর ডাকতে থাকল। কুকুরগুলো নিশ্চয় নদীতে ভেসে যাওয়া মড়া খায়। যেভাবে ওরা আমার দিকে তেড়ে এসে ডাকছিল, মনে হচ্ছিল জ্যান্ত ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। তাদের ওপর টর্চের আলো ফেলে চমকে উঠছিলাম ঝকমকে নীলচোখ দেখে। এই আদিম পৃথিবীর ভয়ঙ্কর প্রাণীজগতে একটা তুমুল সাড়া পড়ে গেছে যেন। মরিয়া হয়ে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে চেঁচাচ্ছিলাম, মুকুন্দ! মুকুন্দ! মুকুন্দো-ও-ও! নিজের কণ্ঠস্বর শুনে অবাক লাগছিল। ভাঙা, ছ্যাৎরানো, কুৎসিত এই কণ্ঠস্বর কি

আমারই।

কুকুরগুলো সরে গিয়ে বিকট চ্যাঁচাতে থাকল। একটা খোলা বাড়ির উঠোনেব সামনে দাঁড়িয়ে আবার মুকুন্দ মুকুন্দ বলে ডাকতে থাকলাম। লোকগুলো একেবারে মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে। একটু পরে ছায়াকালো দাওয়া থেকে কোনো মেয়েব সাড়া পেলাম। সে তার মরদটিকে ওঠানোর চেষ্টা করল প্রথমে। ওঠাতে না পেযে দাওয়া থেকে নামল। জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আলুথালু চুল ও পরনেব শাড়িটা গুছিয়ে ঘুমভাঙ্গা গলায় বলল, কে গো? এটা মুকুন্দর বাড়ি না। উদিকে যাও।

বললাম, আমি বাইরের লোক। মুকুন্দকে খুব দরকার। একটু ডেকে দাও ওকে।

মেয়েটি এবার আমাকে দেখতে পেল। ঘোমটাটা একটু টেনে বলল, আপনি কোত্থেকে আসছেন বাবুমশাই? মুকুন্দকে কী দরকাব? আপনি কি থানার লোক?

না, না! আমি ঝাঁপুইতলায় থাকি। ধনো বাগদিকে দহের ধারে সাপে কামড়েছে।

সে কী! বলে সে আবার তার মবদকে ওঠানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর গজগজ করতে থাকল।··নেশা গিলে পড়ে আছে সব। এখন কি আর পুরুষ ব্যাটাছেলেদের ওঠানো যাবে? কৈ, চলুন, তো দেখি, মুকুন্দ ওঠে নাকি।

সে হন্তদন্ত হাঁটতে থাকল। কুকুরগুলোর গলার স্বর ততক্ষণে কোমল হয়েছে। এখন যেন তাদের গলায় বিস্ময় আর প্রশ্নের সুর। মেয়েটি হাঁটতে হাঁটতে বলল, ধনোকে দহের ধারে পোকায কেটেছে? আপনি বুঝি সেখানে যেযেছিলেন?

বলেই সে একটু চমকাল।···ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি তো ঝাঁপুইতলার সেন্টারেব মাস্টোমশাই। বিকেলে ধনোব সঙ্গে এসে উই গাচতলার মাচানে বসেছিলেন। কিন্তু মাস্টোমশাই, মুকুন্দকে ক্যানে? সে তো গুণিন লয়কো!

বললাম, ধনোর কাছে কমলা আছে। সে বলল—

কথা কেড়ে মেয়েটি বলল, আ মর! সে মাগী ওখানে কী করছিল এত বেতে? টনক নড়েই থাকে খানকির!

কমলাকে গাল দিতে সে আমাকে গণ্যই করছিল না। এই ছোট্ট গ্রামের কোনো বাড়ি ঘিরে পাঁচিল নেই। বাড়ি বলতে খোলামেলা একটুকবো উঠোন আর একটা করে মাটির ঘর। একটা মাটির ঘরের দাওয়ায় মেয়েটি মুকুন, মুকু

বুঝতে পারছিলাম একটা মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সেও এ রাতে অস্থির হয়ে উঠেছে। বয়সে এখনও কিশোর বলা যায় তাকে। তার মাথার বড় বড় চুলগুলো ঝাঁকুনি খাচ্ছে। তাব ঢোলা হাফপ্যান্ট নড়বড় করছে। দুটো কাঠি-কাঠি পা উঠছে নামছে তালে তালে। শিশির ভেজা নুয়েপড়া কাশের ওপর ধারাবাহিক ধুপধুপ শব্দ।

দূর থেকে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছিল লাকুড়তলায় একটা স্থিব স্ফুলিঙ্গেব মতো। মুকুন্দ গতি বাড়াল। এবার কানে এল কমলার গানের সুর। আবও কাছে গেলে স্পষ্ট শুনতে পেলাম। মন্ত্রগানের কথাগুলো শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কৃষ্ণ-রাধার মিলন নিয়ে অত্যন্ত অশালীন সব কথা। গতি কমিয়ে মুকুন্দ বলল, গতিক খারাপ।

কেন মুকুন্দ ?

শুনছেন না বউদি খেউড় গাইছে। মুকুন্দ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল। খেউড় গাইলে রুগীর শেষ দশা। বলেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। চাপা গলায় ফেব বলল, দাঁড়ান একটু। বউদিকে ডাকি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা চোখে পড়ল। হেরিকেনে যথেষ্ট কালিও পড়েছে। দমটাও কমানো। আমি টর্চ জ্বালাতে গিয়ে থেমে গেলাম। কমলা সে-রাতেব মতো সম্পূর্ণ উলঙ্গ। চুল খোলা। সেই বিশাল চুল ওর নগ্নদেহ ঘিরে কালো পর্দার মতো দুলছে। আর সে ধনোর চারদিকে ঘুরে সুর ধরে কদর্য মন্তরটা আওড়ে চলেছে।

মুকুন্দ চেঁচিয়ে ডাকল চেরা গলায়, বউদিদি ! বউদিদি !

অমনি থেমে গেল কমলা। দেখলাম, সে তার কাপড়চোপড় মাটি থেকে তুলে নিয়ে গাছটার আড়ালে চলে গেল। মুকুন্দ শ্বাস ফেলে বলল, একটু দাঁড়ান। ডাকলে পরে যাব।

কমলা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ডাকল, মুকুন। শিগগিরি আয়।

গিয়ে দেখি, ধনো চিত হয়ে শুয়ে আছে। চোখের পাতা খোলা। স্থির। মুখের দুপাশে চাপচাপ ফেনা।

কমলা ওর ঠোঁট দুহাতে ফাঁক করে বলল, ওষুধ ঢেলে দে তো মুকুন।

ওষুধটা গড়িয়ে পড়ে গেল। আমি আস্তে বললাম, আর হয়তো বেঁচে নেই।

কমলা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বলল, জলসাব করতে হবে। মুকুন, তুই কী রে ? বুদ্ধি করে একটা কলসি তো আনবি। আয়, পা দুটো ধব ! মাস্টারমশাই, আপনি কোমরটা ধরুন।

বললাম, কী হবে ?

কমলা বিকৃত মুখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল । শেষ চেষ্টা করতে হবে না ? মানুষটা এমনি করে মরে যাবে ?

ধরাধরি করে ধনোর শক্ত দেহটা নদীর কিনারায় নিয়ে গেলাম আমরা । মুকুন্দ বলল, জল কতটা আগে দেখ বউদিদি ।

বেশি না । সাবধানে নামবি । বলে কমলা আগে নামল ।

এদিকটা ঢালু । কোমর জলে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা । কমলা বলল, একবার করে ডুবুতে হবে আর তুলতে হবে । দেখবেন, হাত ফসকে না যায় । সোঁতে টেনে নিয়ে দহে ফেললে বিপদ ।

সে আবার সুর ধরে মন্ত্র পড়তে থাকল :

'কালীদয়ের জলে কালা কী রূপো দেখাইলা হে
ওই রূপো দেখাও কালা যৈবন সঁপো দিলামো হে
সাঁতালি পর্বতো থেকে গরুড়ো বা কড়িল হে
তুমি রা না কাড়িলে কালা জলেতে ভাসাইব হে ।'

মাঝেমাঝে মন্ত্র থামিয়ে সে ডাকছিল, ধনোদাদা ! ধনোদাদা ! চোখ মেলো গো, চোখ মেলো ! কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদটা লাবুড় গাছের পেছনে চলে গেছে । ঘুমঘুম স্বরে শেষপ্রহরের শেয়াল ডাকছিল তোরাপহাজির বাঁশবনের ওদিকে । নদীর জলে গাঢ় ছায়া আর হলুদ জোৎস্নার ঝিলিমিলি কাঁপিয়ে যেন স্বপ্নের ভেতর নড়ে উঠছিল কোনো অস্থির মাছ । একটু তফাতে দহের জলের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ছিল, ধনো বলেছিল, ওখানে থাকে এক জ্যান্ত শ্বেতপাথর । শাদা ধবধবে তার গায়ের রঙ । জল তোলপাড় করে সে ভেসে ওঠে । বনবন করে ঘোরে । সে কি এখন ঘুমিয়ে আছে অথৈ পাতালে ? সে কি জানতে পারেনি ধনো মরে গেল ?

জ্যোৎস্না ফিকে হয়ে এল । দূরে কাশবনের শিয়রে ডাকতে লাগল হট্টিটি পাখি ট্রি ট্রি ট্রি-ট্রি ট্রি ট্রি ! তারপর একে একে পাখপাখালি সদ্য ঘুমভাঙা স্বরে ডাকতে থাকল । ধূসর এক আলো জেগে উঠল চারদিকে ।

আমার শরীর অবশ । ধরে রাখতে পারছিলাম না । ধনোর কোমর নেমে যাচ্ছিল বারবার । তারপর কমলা ধরা গলায় বলল, চলুন । ডাঙায় নিয়ে যাই ।

তিনজনের গায়েই আর এতটুকু জোর ছিল না । কোনরকমে ধনোর দেহটা টেনেহিঁচড়ে পাড়ে তুললাম । ঘাসের ওপর শুইয়ে দিলাম । কমলার গলা ভেঙে গিয়েছিল । সে আস্তে বলল, মুকুন ! তুই বরঞ্চ ঝাঁপুইতলা চলে যা ভাই ! খবর

দিয়ে আয়। আমরা থাকছি। না থাকলে শ্যালগুলান এসে ছিঁড়ে খাবে।

মুকুন্দ আস্তে আস্তে চলে গেল। কমলা ক্লান্তভাবে লাকুড় গাছটারদিকে এগিয়ে গেল। একটা শেকড়ের ওপর বসে ডাকল আমাকে। কাছে গেলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল, সবই আমার পাপে!

চমকে উঠলাম। কী পাপ তোমার কমলা?

কমলা আস্তে বলল একটা সিগারেট দিন এবার।

প্যান্টের পকেটে সিগারেট দেশলাই ছিল। খেয়াল নেই। জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। বের করে বললাম, খাওয়া যাবে না!

কমলা ব্লাউজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট কৌটো বের করে বলল, বিড়ি খাবেন?

দাও।

পাশের আরেকটা শিকড়ে বসে বিড়ি টানতে টানতে দেখলাম, কমলা আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত বিড়িটা ধরে মুখ নামিয়ে আছে। প্রাণ বাঁচানোর ব্যর্থতায় কি সে খুব দুঃখিত হয়ে পড়েছে? ডাকলাম, কমলা।

একইভাবে থেকে বলল, উঁ?

কী হল হঠাৎ?

একটা কথা ভাবছি।

কী?

কমলা মৃদুস্বরে বলল, ধনোদার একপাল ছেলেমেয়ে। সারাটা কাল খালেবিলে ঘুরে মাছ ধরে ভাইটাকে মানুষ করল। তার বিয়ে দিল। তারপরে এতকাল বাদে সে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছিল। এখন ওদের কী হবে, তাই ভাবছি। ছেলেমেয়েগুলান, ওর বউটা! ওর ভাই রণো কি ওদের দেখবে? দেখবে না। বিষের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে লোকটা খালি ওই কথাই বলছিল। ওদের কী হবে?

একটু পরে সে মুখ তুলল। হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটার কাচ তুলে নিভে যাওয়া বিড়িটা ধরাল আগের মতো। তারপর ফুঁ দিয়ে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল। ভোর হয়ে গেছে এবং এতক্ষণে দিনের আলোয় ডাকিনী আমার সামনে মানবী হয়ে উঠেছে।

ধনোর মড়া কলাগাছের ভেলায় চাপিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভাঁটু মিস্ত্রি মড়াটা না ছুঁলেও নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, যাও ধনপতি নেত্যে

ধোপানির ঘাটে ! লাকুড়তলায় তখন একশো মানুষজন ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। ধনোর বউ সুর ধরে কাঁদছিল। তার ছেলেমেয়েরা পাথরের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে তাদের বাবার ভেসে যাওয়া দেখছিল। দুপুর হতে হতে কাজলি আর ঝাঁপুইতলা থেকে আরও নানাবয়সী মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছিল। ধনপতি দহের মাঝখানে ঘুরপাক খেতে খেতে চলে যাচ্ছিল দৃষ্টির আড়ালে। আর তখনও কমলা তাকে অনুসরণ করছিল। চেরা গলায় গাইছিল সে .

'নেতা ধোপানি কাপড় কাচে মন পবনের ঘাটে

এ বিষ পাইল কোথা সাঁতালি পর্বতে...'

মাঝে মাঝে সে দোহাই দিচ্ছিল . 'দোহাই মা মনসার দোহাই দোহাই বাবা খোঁড়া পীরের দোহাই

দোহাই বাবা ভোলার দোহাই...'

একটা প্রাণ ফিরে পাওয়ার ব্যাকুলতা যেন নদীকেই অনুসরণ করছিল। যেন নদীর কাছেই প্রার্থনা। শেষ শরতের বাতাসে কমলার চুলগুলো উড়ছিল। বাঁওরের বাঁকের মুখে তাকে শেষ বার দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর কাশবনের আড়ালে চলে গেলে ভাঁটু বলেছিল সে অনেকদূর যাবে ধনপতির সঙ্গে।

জিগ্যেস করেছিলাম, কেন ভাঁটু ?

শেষ চেষ্টা। ডাকিনী বলে কথা ! সহজে তো ছাড়বে না।

পরে হংসধ্বজ বলেছিলেন, এই একটা অদ্ভুত বিশ্বাস। সাপেকাটা মড়া দাহ করবে না। কলার ভেলায় নদীতে ভাসিয়ে দেবে। ভেলা ভাসতে ভাসতে যাবে। পরের গ্রামের সামনে গেলে সেখানে ওঝা বা গুণিন থাকলে সে ভেলাটা আটকাবে। মন্ত্রতন্ত্র আওড়াবে। না বাঁচলে ভেলাটা আবার ঠেলে দেবে জলে। এমনি করে যতদূর ভেসে যাবে, ততদূর এই ব্যাপার। ততক্ষণে রাইগর মর্টিস শুরু হয়েছে এবং ক্রমশ পচ ধরেছে। তবু চেষ্টা। কিন্তু কেন এই উদ্ভুটে চেষ্টা জানো ? সব সাপ বিষাক্ত নয়। আবার বিষাক্ত সাপও সবসময় ফেটাল ডোজ ঢালতে সুযোগ পায় না। এসব কারণে অনেক সাপেকাটা মানুষ বেঁচে যায়। ওঝারা ভাবে...

হংসধ্বজ হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, 'ঝড়ে কাক মরে/ফকিরের কেরামতি বাড়ে।' কিন্তু তুমি বাপু কাজটা ঠিক করোনি। বললে যাচ্ছি বহরমপুর, গেলে বনবাদাড়ে। নেচারকে বাইরে থেকে দেখাই ভাল। ভেতরে নেচার এক রাক্ষুসে জন্তু। ধরো যদি উল্টে তোমারই একটা কিছু হত !

আমার হলে কী হত ? আমার তো ধনোর মতো বউছেলেমেয়ে নেই যে তারা

ভিখিরি হয়ে যেত !

এ তোমার রাগের কথা মুকুল ! হংসধ্বজ গম্ভীব হয়ে বলেছিলেন। তুমি আমার ডাকে এসেছ ! আমার কাছে আছ। তোমাব কিছু হলে সব দায়িত্ব আমাব। একটা কথা বলি তোমাকে। আমাকে যেন কখনও মিথ্যে বলো না।

বুঝতে পেরেছিলাম, হংসধ্বজ একটু বিরক্ত হয়েছেন আমার আচবণে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তাবপব আবাব মুখে নির্মল হাসি। শিশির জল আর হাওয়ার ধাক্কাটা যাতে সামলাতে পারি, একডোজ হোমিওপ্যাথি খাইয়ে দিয়ে বলেছিলেন, প্রিভেন্টিভ ওষুধ দিলাম। দুটোদিন একটু সাবধানে থাকবে। রাতের দিকে হিম লাগাবে না। দিনে রোদেবাতাসে আর টোটো করে ঘুববে না ভাঁটুর সঙ্গে। ভাঁটুও ধনপতির দোসর। ওর কথায় যেখানে-সেখানে হুট করে চলে যেও না। ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে ডাকিনী দেখাতে চেয়েছিল !

ধনোর মৃত্যুতে পরের দিনটা সেন্টার বন্ধ ছিল। পরের দিন সন্ধ্যার পব ক্লাস শুরু হবার আগে হংসধ্বজ এসে ধনোর আত্মাকে শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করতে বলেছিলেন। একটা ভাষণও দিয়েছিলেন। তারপব কেউ বলেছিল, রনো এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তাকে টানাটানি করে ভেতরে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকে রনো হাইহাউ করে কাঁদে আব বলে, আর আমার ন্যাকাপড়ায় ইচ্ছে নেইকো মাস্টোমশাই গো ! আমাব মোন ভেঙ্গে গেছে।

ওদের পড়শি হরিহব সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'লোক্' (চুপ) করে একপাশে বসে থাকো রণপতি ! দুটোদিন মোনটাকে বেঁধে লাও ! হুঁ—আসতে ভুলো না সেন্টারে। এলে বরঞ্চ সবাইকে দেখে মোনে বল পাবে।

রনো খালি ফুঁপিয়ে কাঁদে অবুঝ বাচ্চার মতো।

কিন্তু পরদিন থেকে সে সত্যি আর এল না। দুদিন পরে ভাঁটুর সঙ্গে বিকেলে তার খোঁজে গেলাম বাগদিপাড়ায়। একটুকরো উঠোনের দুদিকে দুটো খেড়ো নিচু ঘব। মুখোমুখি দুই ভাইয়ের বসবাস ছিল। ধনোর বউ আমাদের দেখেই আকাশ ফাটিয়ে কান্না জুড়ে দিল। ভাঁটু বিব্রত হয়ে বলল, চুপ, চুপ ! কেঁদে কী ফল হবে আব ?

ধনোর বউ একটু পরে চোখ মুছে বলল, মরাব সময় আপনি তো পাশে ছিলেন মাস্টোমশাই ! কিছু বলে যায়নি তারাপদর বাবা ?

বললাম, না তো।

আমি এখন কী করব, মাস্টোমশাই—ছেলেমেয়েগুলান কী খাবে ?

ভাঁটু বলল, হ্যাঁ গো, ওটা কি একটা কথা হল ? তোমাদেব পাড়ার আরও

পাঁচটা মেয়েছেলে যা করছে, তুমিও তাই করবে। জাল হাতে সকলের সঙ্গে বেরুবে। মাছ ধরে বাজারে বেচে আসবে। ভাবনা কিসের?

রনোর বউ অনেকটা ঘোমা টেনে উঠোনের উনুনে ভাত রাঁধছিল। মেয়েটি তেজি। ঘোমটার ফাঁকে মুখঝামটা মেবে বলল, একটু থামো তো দিদি! বাড়িতে মানুষ।

'মানুষ' শব্দটার নতুন ব্যবহার ঝাঁপুইতলায় এসে লক্ষ্য করেছিলাম। এ মানুষ শ্রদ্ধার মানুষ। ভাঁটু বলল, হ্যাঁ গো বউ, রণপতি কোথা?

রণোর তেজি বউটি ঘোমটার ভেতর বলল, সে আর ছেন্টারে যাবে না।

ক্যানে বলো দিকিনি?

যাবে না। তার আবার ক্যানে-ট্যানে কী!

ভাঁটু চটে গিয়ে বলল, মেজবাবু বারণ করেছে বুঝি?

রণোর বউ ঝাঁঝালো গলায় বলল, মেজবাবু খেতে দেয় না পরতে দেয় যে বাবণ করবে, তাই শুনবে।

ভাঁটু একটু নরম হয়ে বলল, তাইলে কথাটা কী?

নেকাপড়া শিখে দালান দেবে, না উঠোনে মড়াই বাঁধবে? রনোব দুর্ধর্ষ বউ চেঁচিয়ে উঠল। রোজ বাত করে বাড়ি ফিবে বলবে, আজ আর জলকাদায় নামতে ইচ্ছে করছে না। রাত্তিবে জলকাদায় না নামলে চলে? রাত্তিরেই তো মাছধরার কাজ। দিনে টো-টো করে ঘুরে খালি খালুই হাতে বাড়ি ফিরবে আর বলবে, কুসাত হয়েছিল। হুঁ, বুঝি না আবার? দুকলম শিখেই বাবুর ব্যাটা বাবু হয়ে গেছে। আর জলকাদা ঘাঁটতে ইচ্ছে করবে ক্যানে? ইদিকে পেটের ভাতটা পরনের কাপড়টা—

ভাঁটু বলল, ধুত্তেরি মেয়েমানুষের ক্যাথায় আগুন। বনো কোথা, তাই শুধোচ্ছি। আর পুঁটুলি খুলে দিলে।

ধনোর বউ শোকে ভাঙ্গা কণ্ঠস্বরে বলল, দুদিন থেকে বাউড়িপাড়া যাচ্ছে ঠাকুরপো। হলার বাড়ি গেলেই দেখতে পাবে।

বেরিয়ে গিয়ে ভাঁটু চাপা গলায় বলল, বুঝলেন ব্যাপারটা?

না তো!

হলার বাড়ি পচুই মদ গিলতে যায়। ধনোর এ স্বভাবটা ছিল না। ভাইকে খুব বকাবকি করত। সেন্টার হওয়াতে একটা সুবিধে হয়েছিল। রনোর পচুই খাওয়া এমনিতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ক্যানে—না, মাতাল হয়ে সেন্টারে ঢোকা যাবে না। এখন ধনো নেইকো।

আবার শুরু করেছে।

একটা লোক দাওয়ায় বসে জাল বুনতে বুনতে কান করে ভাঁটুর কথা শুনছিল। নিজেকে শোনানোর ভঙ্গীতে বলে উঠল, নেশা না করবে তো জলকাদা ভাঙবে কী করে? মাথায় লিওর লিয়ে ঠায় এক বুক জলে দাঁড়িয়ে থাকা কি সহজ?

ভাঁটু গুম হয়ে গেল। এ মুহূর্তে আমারও মনে হচ্ছিল, সেদিন মেজবাবু চন্দ্রকান্ত যা বলছিলেন, তা হয়তো খুবই সত্যি। হংসধ্বজের এ এক পাগলামি।

কালকাসুন্দে আর ঘেঁটু ফুলের জঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে ভাঁটু বলল, বাবুপাড়াব মুড়োয় চলে এসেছি। যাবেন নাকি একবার চিমনিদের বাড়ি বসোবাবুর খবর নিতে?

কোনটা ওদের বাড়ি?

ওই তো শিবমন্দিরের পাশে। ভাঁটু একটু হাসল। রেতের বেলা এসেছিলেন। চিনবেন কী করে?

জায়গাটা ধ্বংসপুরী বলা যায়। বর্ষাব জল খাওযাব পর গাছপালা ঝোপঝাড় জাঁকিয়ে মাথা তুলছে। বিকেলের আলোয় ওই ভাঙ্গাচোরা বাড়িটাও উৎসবেব পোশাক পরে হাসিখুশি যেন। ভাঁটুর ডাক শুনে চিমনি সাড়া দিল ভাঙা পাঁচিলের ওপাশ থেকে। হঠাৎ খেয়াল হল, চিমনির কণ্ঠস্বরে একটু পুরুষালি ভাব আছে যেন। একটু বসে যাওয়া—অথবা সদ্যঘুমভাঙা কণ্ঠস্বর। আগে এসব লক্ষ্যই করিনি।

পেছন দিকে ইটমাটির স্তূপে কচুর ঝাড়। তার ওপর কেন কে জানে আশ্চর্যভাবে একটা সাদা প্রজাপতি এন্তার নেচে চলেছে। চিমনি পাশ থেকে উঁকি মেবে আমাকে দেখে হাসল। মিস্তিবিকাকার গলা শুনেই বুঝেছিলাম আপনিও আছেন। আসুন, আসুন।

চিমনির হাতে একটা পুবনো বাঁধানো পত্রিকা। ছাদহীন খোলা বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে সে ওটা পড়ছিল তাহলে। বইটা একপাশে রেখে বলল, আজ চা খেতে হবে। তারপর দুষ্টুমির ভঙ্গীতে হাসল।...ডাঁসা পেয়ারাব শোধ।

ভাঁটু একটু তফাতে নগ্ন ইটের ওপর পা ঝুলিযে বসল। আমি বসলাম মাদুরে। ভাঁটু বলল, বাবার খোঁজ পেলে চিমনিদিদি?

চিমনি বারান্দার কোণায় পাতা উনুনে একটা প্রচণ্ড কালিমাখা কেটলি বসিয়ে শুকনো খড়কুটো ঢোকাচ্ছিল। দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে বলল, বাবাকে আর সহজে পাওয়া যাবে না।

ভাঁটু হাসতে হাসতে বলল, কিছু বলাও যায় না। হঠাৎ আবার ছুট করে এসে পড়বেন দেখবে।

চিমনি লকড়ি ঠেলতে ঠেলতে বলল, কেরোসিনের আকাল পড়ে গেছে এদের দেশে। মিস্তিরিকাকা, তোমরা কোথায় কেরোসিন পাচ্ছ গো?

ভাঁটু বলল, সে কী! গগন দত্তর দোকানে কালই তো দেখলাম লাইন পড়েছে!

চিমনি আমার দিকে ঘুরে বলল, বাগদিপাড়ার কাকে যেন সাপে কামড়েছিল। আপনি তখন নাকি ওর সঙ্গে ছিলেন। সত্যি নাকি মাস্টামশাই? দেখেছিলেন সাপটা?

বললাম, ওইসময় ছিলাম না কাছে। পরে—

চিমনি উঠোনের দিকটা দেখিয়ে বলল, জানেন? ওখানে মাঝেমাঝে একটা সাপ বেরোয়। সবাই বলে বাস্তুসাপ! বোগাস! কবে আমি মেরে ফেলব ঠিকই। যেতে যেতে লুকিয়ে পড়ে যে!

ভাঁটু হাঁ হাঁ করে উঠল। উঁহু—কক্ষনো না। কক্ষনো না। বাস্তুসাপ মারতে নেই।

রাখো তোমার বাস্তু না হাতি! চিমনি মুখে নিষ্ঠুরতা এনে বলল। আমার পাল্লায় পড়লে ঠ্যালা টের পাবে'খন।

আমার অবাক লাগছিল, এই ভাঙা পড়ো-পড়ো বাড়িতে এক যুবতী মেয়ে—অনেকগুলো বছর যার কলকাতার মতো বড় শহরে কেটেছে, সেখানে লেখাপড়া শিখেছে, সে একা বাস করছে! বাবা বদ্ধ পাগল। বাড়িটাতে একটা সাপেরও আস্তানা। আর ওইভাবে উনুনে কাঠকুটো জ্বেলে তাকে রান্না করে খেতে হয়! কেরোসিন পায় না। আলোও হয়তো জ্বলে না রাতে। কেন সে এমন করে বেঁচে আছে? তার কি কোনো আত্মীয়স্বজনও নেই যে তাকে আশ্রয় দেবে?

চিমনির চোখে চোখ পড়লে সে মিটিমিটি হাসল। ভাবছেন খুব কষ্ট হচ্ছে আমার? মোটেও না। পিকনিক করেছেন কখনও? আমার পিকনিকের মজা—প্রতিদিন।

আচ্ছা কুন্তলা, আপনার—

চিমনি বাধা দিয়ে বলল, কুন্তলা বললে লোকেরা অবাক হয়ে যাবে। আমি স্রেফ চিমনি। আর শুনুন, আপনি বলাটা ছাড়ুন। জীবনে কেউ আমাকে আপনি বলেনি। শুনতে বিচ্ছিরি লাগে।

ভাঁটু মিস্ত্রি খি খি করে হাসতে লগল। চিমনি দিদি যা কথা বলে না ? হাসতে হাসতে—

চুপ। আমি কি জোকাব ? চিমনি ধমক দিল।

সে লকড়ি ঠেলে দিয়ে যেন শূন্যে ভেসে ঘরে ঢুকল। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। জ্বালটা আবার ঠেলে দিল। চা কবার সময় তার মুখে একধরনের নিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছিলাম।

খুব সুন্দর একটা কাপপ্লেটে আমাকে চা দিল সে। ভাঁটুকে দিল কাচের গ্লাসে। ভাঁটু খুব খুশি হয়ে ফুঁ দিতে দিতে শব্দ করে খেতে থাকল চা। চিমনি একটা যেমন-তেমন কাপে চা নিয়ে চৌকাঠের কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, মিস্তিরিকাকা, বলো তো চা বানান কী ?

ভাঁটু বলল, তাতে আমাকে কাবু করতে পারবে না। চয়ে আকার চা। আর খয়ে আকার খা। সে দুলেদুলে হাসতে লাগল। তার ভুঁড়িটা বেজায় নাচতে থাকল।

চিমনি বলল, বলো তো কাপ বানান কী ?

কয়ে আকার প কাপ।

আমার নাম বানান করো।

এই তো মুশকিলে ফেললে। ভাঁটু বিড়বিড় করতে করতে আমার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে বলল, চিমনি তো আমার বইয়ে নেই, নাকি আছে মাস্টোমশাই ?

চিমনি খিলখিল করে হেসে উঠল। কী মাস্টাবমশাই ? আপনার ছাত্রকে কী শেখালেন তাহলে ?

বললুম, তোমার নামের বানানটি শেখানো হয়নি অবশ্য। শেখাব।

চিমনি মুখটা একটু ঘোরাল অন্যদিকে। গালটা হয়তো লাল হয়ে উঠেছিল। আমার কথায় কি অন্য কোনো সুর বেজেছে ? ভাঁটু বলে উঠল, চয়ে হস্বোই চি—তা'পরে মো—চি হল, মো হল। তা'পরে—

চিমনি বলল, থামো ! মো ! ম বলতে পারো না ?

ম ম। ভাঁটু বলল। চয়ে হস্বোই ম—

ডাকলাম, কুন্তলা !

চিমনি বড় চোখে তাকাল। তখন বললাম, আচ্ছা চিমনি, ওসব কথা থাক। একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।

কী ?

তোমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই?

চিমনি নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বলল, আমাকে দেখে মায়া হচ্ছে তো? বুঝেছি। আমাকে দেখে গাঁসুদ্ধ লোকের মায়া হয়। বলে মামা-টামার বাড়ি গিয়ে থাকতে পারো না? পারি না। অভ্যাস নেই কারুর বাড়ি থাকা। কেন—বেশ তো আছি। একা পেয়ে বদমাইসি করবে? করে দেখুক না, চিমনি কী জিনিস! ভাঁটু বলল, হ্যাঁ গো, কেরোসিন নেই বলছ, তো রাত্তিরে জ্বালবে কী?

চিমনি একই সুরে বলল, নিজেই জ্বলব। আমি তো চিমনি!

ধুস! ভাঁটু উঠে দাঁড়াল। ওটা কি একটা কথা হল? রাতবিরেতে একা মেয়েছেলে থাকো। আলো-টালো না থাকলে চলে! কাছাকাছি বাড়ি হলে বরঞ্চ বউটাকে পাঠিয়ে দিতাম। এসে পাশে থাকত। কৈ, বোতল দাও।

চিমনি ভুরু কুঁচকে বলল, পাবে?

দেখি চেষ্টা করে। ভাঁটু মিস্ত্রি অমায়িক স্বরে বলল। দত্তকে বলে দেখি। নয়তো, আমার বাড়ি থেকে খানিক এনে দিচ্ছি। শিগগিরি পাত্তর দাও।

চিমনি একটা বোতল এনে দিল ঘর থেকে। ভাঁটু আমাকে অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে গেল।

চিমনি এঁটো গ্লাস আর কাপপ্লেট নিয়ে গেল উঠোনোর কোণায়। জবাফুলের ঝাড়ের পাশে একটা বালতিতে জল রাখা ছিল। ধুতে থাকল। ভাঁটুর গ্লাসটা সে ধুতে পারছে। কিন্তু আমি জানি, এ গ্রামে কোনো ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে এটা কিছুতেই করবে না। চিমনি কলকাতায় বড় হয়েছে বলেই তার হয়তো এসব সংস্কার নেই।

পাত্রগুলো ঘরে রেখে এসে সে একটু হাসল। আজ আমার কী লাক।

কেন বলো তো?

ভাগ্যিস আপনারা এলেন। নৈলে আজও মোম জ্বালতে হত। বাজার থেকে বুদ্ধি করে কিনে এনেছিলাম। কখন কিনলাম জানেন? সেদিন সকালে আপনাকে বকাবকি করে বাবাকে খুঁজতে গেলাম বাজারের বাসস্টপে। তখন হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল।

তোমার লাকটা তাহলে আমাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে।

চিমনি আবার সেই লজ্জার সুন্দর ভঙ্গীটা করল। তারপর আস্তে বলল, আপনার নামটা এখনও জানি না কিন্তু। সবাই মাস্টারমশাই বলে। জিগ্যেস করলে বলতে পারে না।

মুকুল মুখার্জি।

চিমনি সামান্য নড়ে উঠল। তারপর হেসে ফেলল।

বললাম, হাসছ যে?

কিছু না, এমনি। হাসি থামিয়ে চিমনি একটু সিরিয়াস হল। আপনার বাড়িতে কে আছে আর?

শুধু মা আর ছোট একটা বোন।

বোনের কত বয়স? কী পড়াশুনো করে?

ক্লাস নাইনে পড়ে।

চিমনি একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনারা নিশ্চয় বড়লোক?

সে কী। কেন একথা মনে হল তোমার? আমাকে দেখে বড়লোক মনে হয়?

বড়লোক না হলে এই সখের মাস্টারি করতে কেউ আসে নাকি?

একটু হেসে বললাম, কী করি! কিছুই যে পাচ্ছিলাম না। অগত্যা যা হোক একটা নিয়ে থাকা। তাছাড়া কাজটা আমার মন্দ লাগছে না। লোকগুলোও খুব ইন্টারেস্টিং—মিশতে ভাল লাগছে। এদের কোনো ভণ্ডামি নেই। সরল। আর—

থামুন। চিমনি থামিয়ে দিয়ে বলল। নতুন এসেছেন। পাড়া গাঁ কী জিনিস জানেন না এখনও, তাই। কিছুদিন থাকুন, তখন বুঝবেন। লেজ তুলে পালাতে ইচ্ছে করবে।

তোমার ইচ্ছে করে বুঝি?

চিমনি সিরিয়াস হয়ে বলল, করে না, বলব না। নিশ্চয় করে। কিন্তু এই পাড়াগাঁয়েই আমার জন্ম। সাত বছর বয়স অব্দি এখানে কাটিয়েছি। তারপর বাবা আমাদের নিয়ে গেলেন কলকাতা। এতকাল পরে ফিরে অ্যাডজাস্ট করতে সত্যিই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ সয়ে গেছে। না সইয়ে উপায় তো নেই। বাবার ওই অবস্থা।

বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছ না কেন?

অনেক করেছি। সারে নি। চিমনি মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। তবে যে ট্রিটমেন্টে সারত, তাতে টাকা লাগে। মেন্টাল ক্লিনিকে রাখার টাকা কোথায়?

একটা কথা জিগ্যেস করছি। কিছু মনে কোরো না।

চিমনি মুখ তুলে বলল, বলুন।

তোমার সংসার চলছে কীভাবে?

চিমনি সরলভাবে হাসল। ও এই কথা? বাবার কিছু টাকা আছে পোস্ট

অফিসে, সামান্যই। চালিয়ে নিচ্ছি ওই দিয়ে।

টাকা তুলতে তো ওঁর সই লাগে?

চিমনি আস্তে বলল, না। আমার নামে অ্যাকাউন্ট। বাবা মাঝেমাঝে আশ্চর্যভাবে ভাল হয়ে যায়, জানেন? তখন ভারি শান্ত। মাটির মানুষ একেবারে। তারপর হঠাৎ আবার তাই।

আঁধার ঘন হবার আগেই পোকা মাকড়ের ডাক শুরু হয়েছিল। গ্রামের এই প্রাক-সন্ধ্যাটা বুকে চেপে বসার মতো একটা ওজনদার ব্যাপার। চারদিকের চাঞ্চল্য কখন একসময় ঝিম মেরে আসে। জীবন থেকে সব কিছু যেন ফুরিয়ে গেল, অথবা উচ্চকিত ও হঠকারী আকাঙ্ক্ষাগুলো কেন কে জানে চুপ করে গেল। থিতিয়ে গেল সবকিছুই একটা বড়োসড়ো স্তব্ধতার তলায়। সেই স্তব্ধতাটা যেন নেমে এল আকাশ থেকে, যেখানে রঙচঙে মেঘে গাঢ় হয়ে মেখে গেছে পৃথিবীর সব অতৃপ্ত কামনাবাসনা।

চিমনির চাপা শ্বাস ফেলার শব্দে মুখ ঘোরালাম। ওকে এখন খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। নিজের ভেতর নিজেকে আটকে রাখার মতো ওর ভঙ্গী এবং কণ্ঠস্বর। কিছু আবার বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করেছিল, দুপ দাপ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে এসে গেল ভাঁটুচরণ। একমুখ হাসি। বোতলের আদ্ধেকটা ভরে এনেছে। এতেই তার দিগ্বিজয়ী উল্লাস। হাঁকডাক ছেড়ে বলল, একেবারে মূলে গিয়ে ধরেছিলাম। দত্তর গিন্নিকে। দত্ত কাহিল হয়ে বলে, ধুস শালা! ডিলারি ছেড়েই দোব বরঞ্চ। ঘরে বাইরে 'নানছনা' আর সওয়া যায় না।

চিমনি বাঁকা মুখে বলল, ওইটুকুন?

ভাঁটু জিভ কেটে বলল, বোলো না, বোলো না! ভীষণ আকাল। ওইটুকুন যে আনতে পেরেছি, আমি বলেই। কারুর সাধ্যি নেই আর। মাথা ভাঙ্গলেও—মাস্টোমশাই, গল্প করবেন, নাকি যাবেন? আমার একটুকুন কাজ পড়েছে আবার।

চিমনি বলল, তুমি যাবে তো যাও! মুকুলদা চিনে যেতে পারবেন। পারবেন না?

হয়তো পারব। কিন্তু—

হয়তো আবার কী? এ কি কলকাতা শহর? ঝাঁপুইতলা। বলে চিমনি হেরিকেনে তেল ঢালতে গেল।

ভাঁটু আমাকে চোখ টিপে চলে আসতে ইশারা করল। বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়ালাম। কুন্তলা, আমি আজ চলি বরং। আবার একদিন আসা যাবে।

ভাঁটুও বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। এলেই হল। ওড়াপথে তো দু'পা রাস্তা। ঘুরপথ বলেই একটুখানি দূর।

চিমনি আমার দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে হেরিকেন জ্বালতে থাকল। মনে হল দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু ভাঁটুকে অস্বীকার করার সাহস ছিল না। চলে এলাম।

রাস্তায় গিয়ে ভাঁটু বলল, পাড়াগাঁব ব্যাপার, বুঝলেন না ? সঙ্গেতে আমি ছিলাম—সে একটা কথা। আইবুড়ো মেয়ে হাজার হলেও। আপনার সাদা কাপড়খানাতে কালিব ছিটে লাগা খুব সহজ নয় কি না ?

আস্তে বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ।

ভাঁটু চাপাগলায় বলল, ওই যে বাড়িটা দেখছেন চিমনিদের ওপাশটাতে। সতু কায়েতের বাড়ি। দিনরাত্তিব ঘরেব জানালায় চোখ রেখে বসে থাকে। আমরা পেছন দিয়ে বেরোলাম, তার কাবণ বুঝতে পারছেন ? তখন বোতল নিয়ে যাচ্ছি তো হেঁপো কায়েত বলে কী, কী হে মিস্তিরি। বসোদাব বাড়ি এত ঘনঘন—শালা হেঁপো! আজ বাদে কাল দম আটকে মরবি!

হাঁপের রোগী বুঝি ?

ভাঁটু শ্বাসের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ। সম্পর্কে চিমনির কে যেন হয়। তবে কথা বলাবলি নেইকো। ঘরে সাতটা আইবুড়ো মেয়ে সতুবাবুর। চরতে বেরোয় বিকেল হলেই। কাউকে দেখবেন সেই হাইরোডের মোড়ে বাজারতলায়। কেউ মেজবাবুর বাড়ি গিয়ে ধন্না পেতেছে। কেউ মোছলমানপাড়ায় আসগরের মুদিখানায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কেন ?

ভাঁটু গলার ভেতব বলল, ধাবদেনা বন্ধক-ছন্ধক না দিতে গেলে কাল খাবে কী ? বলে সে থুথু ফেলল সশব্দে। গলা চড়িয়ে ফেব বলল, বিষ নেইকো। কুলোপানা চক্কব ভম্মও।

কালীপুজোর আগেব দিন দুপুরে খেয়েদেয়ে শুয়ে আছি। হংসধ্বজ গেছেন কলকাতা। ফিরবেন পরেব দিন। ফিবতে বিকেল হয়ে যাবে। বলে গেছেন, নকুলকে সঙ্গে নিয়ে যেন বাজারেব বাসস্টপে থাকি। কেন তা বলে যাননি।

বাইরেব বারান্দায় দুপদাপ শব্দ হল। তারপর কেউ হেঁড়ে গলায় হাঁসুদা হাঁসুদা বলে ডাকাডাকি শুরু করল। সেই সঙ্গে দরজার কড়া নড়াতে থাকল প্রচণ্ডভাবে। নকুল তা হলে বাড়ি গেছে। ফুল ফলেব গাছ পাহারা দেবার কথা

তার। উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই কড়া ধমক, আপনি কে ? হাঁসুদা কোথায় ?

কতকটা হাঁসুদার মতো দেখতে রোগা ঢ্যাঙা এক ভদ্রলোক। পরনে ঢোলা প্যান্ট শার্ট, মাথায় একটা শোলার টুপিও আছে। বেডিং, বাক্সপেঁটরা বয়ে আনছে গেটের বাইরে দাঁড়ানো রিকশো থেকে একটি গোলগাল নাদুস-নদুস চেহারার ছেলে। ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন গিন্নিচেহারার এক মহিলা আর চিমনিদের বয়সী এক যুবতী।

একটু অবাক হয়েছিলাম। হংসধ্বজ কারুর আসার কথা বলে যাননি। তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজনের কথাও বলেননি কখনও। জিগ্যেস করলে বলেছেন, আমি চিরপরিত্যক্ত। আমার আবার আত্মীয়স্বজন ?

ভদ্রলোক আবার ধমক দিলেন, কে আপনি ?

বললাম, আমি এখানে থাকি। অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টারের টিচার।

অ। তা হাঁসুদা কোথায় ?

কলকাতা গেছেন গতকাল। আগামীকাল ফিরবেন।

ভদ্রলোক তাঁর গিন্নিকে বললেন, তা হলে চিঠি পায়নি। দেখছ কাণ্ড ? বলে বাক্স-পেঁটরা ঘরে ঢোকাতে ব্যস্ত হলেন। ঝিমি, কী দেখছিস হাঁ করে ? বেডিংটা নিয়ে আয়। ওগো, তুমি গিয়ে দেখ, রিকশোয় কিছু পড়ে থাকল নাকি। ভোঁদার ওপর ভরসা হয় না।

ঝিমি বাবার কথা গ্রাহ্য করল না। এত ফুল, এত ফুল বলে উন্মাদিনীর মতো বাগানে গিয়ে পড়ল। দেখলাম, হংসধ্বজের খুব সাধের বিদেশি ফুলের ঝাড়টাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে প্রায় শুয়ে পড়ার ভঙ্গী করেছে।

দুটো ঘর সামনা-সামনি, পেছনে একটা ঘর কিচেনের লাগোয়া। সেটায় আমি থাকি। সামনের দুটো ঘরের বড়টায় হংসধ্বজ, অন্যটায় তালাবন্ধ থাকে সব সময়। ভেতরে কী আছে এখনও টের পাইনি। হংসধ্বজের ঘরটা জিনিসপত্রে ভরে যেতে দেখছিলাম। এত জিনিসপত্র এঁরা কেন এনেছেন, বুঝতে পারছিলাম না। গোল গোল চেহারার কিশোরটি ঘরে ঢুকেই হংসধ্বজের বিছানায় রাখা বইপত্তর, হোমিওপ্যাথির বাক্স এবং হরেক জিনিস ঘাঁটিতে শুরু করল। ভদ্রলোক তাঁর লাগেজ গুণে গুণে হয়রান। বার বার খেই হারিয়ে ফেলছেন এবং ফের এক থেকে শুরু করছেন। আমি ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছি। ভোঁদাকে বারণ করব ভাবছি, কিন্তু ধমক খাবার ভয়ে সাহস হচ্ছে না। নিশ্চয় হংসধ্বজের কোনো নিকট আত্মীয়। তা না হলে এমন দাপটে ঘরে ঢুকবেন কেন ?

ভোঁদা চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ ! বাবা ! বাবা ! ইঞ্জেকশান।

তাকিয়ে দেখি, হংসধ্বজের বাক্সো থেকে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ বের করে ফেলেছে। বললম, হাঁসুকাকা বকবেন। ওটা রেখে দাও খোকা ?

ভোঁদা সিরিঞ্জে সূচ পরিয়ে বালিশে প্যাঁক করে সূচ ঢুকিয়ে হি হি করে হেসে উঠল। তার বাবা বলল, অ্যাই। কী হচ্ছে ? রেখে দাও বলছি।

ভোঁদা গ্রাহ্য করল না। হংসধ্বজের বালিশটাকে ঝাঁঝরা করতে থাকল। ভদ্রমহিলা ভেতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ওদিকের উঠোন এবং পরিবেশ দেখছিলেন। তারপর তাঁকে কিচেনে গিয়ে ঢুকতে দেখলাম।

এতক্ষণে জিগ্যেস করতে মনে পড়ল এঁরা কে, কোত্থেকে এসেছেন। ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে যেন সেটা টের পেয়ে গেলেন। হ্যাট খুলে ফ্যানের সুইচ টিপে প্রকাণ্ড টাকে হাওয়া নিতে নিতে বললেন, আমি হাঁসুবাবুর পিসতুতো ভাই। আমার নাম বি বি বোস। থাকি সিউরিতে। আপনার নামটা জানতে পারি ?

নাম শুনে বললেন, অ। তা আপনি হাঁসুদার কাছেই থাকেন ?

মাথা নাড়লে হ্যা হ্যা করে হেসে বললেন, হাঁসুদার কারবারই আলাদা। যখন মাথায় যে খেয়াল চাপে। একবার এসে দেখি মহিলা ত্রাণ সমিতি করেছে! হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা···কৈ গো, কোথা গেলে ? দ্যাখো তো, কিচেনে চা-ফা আছে নাকি ? ও মশাই, যান না একটু। দেখিয়ে দিন গে।

এই সময় ভোঁদা ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জটা নিয়ে চিপ্পুর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দিদি, দিদি। তোকে ইঞ্জেকশান দেব।

দরজায় উঁকি মেরে দেখি, ভাইবোন হংসধ্বজের সাধের বাগান তোলপাড় করে লুকোচুরি খেলার মতো ছুটোছুটি করছে। না-খেলা নয়। ঝিমি চেঁচাচ্ছে, বাবা! বাবা! ভোঁদাকে ধরো। আমাকে ইঞ্জেকশান দিতে আসছে। ঝিমির আর্তনাদের সঙ্গে ভোঁদার বিকট হিহি শোনা যাচ্ছিল।

বোসবাবু আমাকে ধমক দিলেন ফের। ওদিকে কী দেখছেন মশাই ? বললাম না কিচেনে গিয়ে দেখিয়ে দিন ? কিছু না থাকলে আবার আনাতে হবে। সেই কখন সব খেয়ে বেরিয়েছে। যান, যান। একটু হেল্প করুন।

একটু ইতস্তত করে বললাম, ফুল গাছগুলো ভোঁদা হয়তো নষ্ট করে ফেলছে। আপনি একটু—

সে আমি দেখছি। বলে বোসবাবু বেরিয়ে গেলেন। ভোঁদা, ভোঁদা, বলে হাঁক ডাক শুনলাম। কিচেনে গিয়ে দেখি, বোসগিন্নি অভ্যস্ত হাতে সব গুছিয়ে নিয়েছেন। কেরোসিন কুকারের ওপর কেটলি চড়িয়ে নাকের ডগা কুঁচকে

বললেন, কে রাঁধে ? ছ্যা ছ্যা, যত নোংরার গাদা। ভাসুর মশাই এদিকে খুব ফিটফাট, ধোপদুরস্ত বাবু। অন্যদিকে এ কী অবস্থা ! শোনো ছেলে, এক বালতি টাটকা জল এনে দাও আমাকে। দুমুঠো আলুভাতে কবে দিই।

বালতি হাতে নিলে ফের বললেন, কিন্তু ভাত করব কিসে ? একটা হাঁড়ি তো দেখছি না। এটা এঁটো ওটা এঁটো—কী বিপদ। তোমাদের এসব ধোযাপাখলাব কাজ করে কে ?

আজ্ঞে, নকুল নামে একটা লোক।

ও। সেই নোকলো ? জলটল থাক। আগে তাকে ডেকে আনো। ততক্ষণ কাপড়-টাপড় ছেড়ে রেডি হয়ে নিই।

বালতি রেখে বেরিয়ে গেলাম। বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে থামে পা তুলে দিয়ে বোসবাবু চোখ বুজে সিগারেট টানছিলেন এবং দুলছিলেন। বাগানে ভোঁদা ও তার দিদিকে না দেখে স্বস্তি হল। কিন্তু গেটে গিযে ফের তাদের খুঁজে দেখি, ওপাশের সেই ফলন্ত পেয়ারা গাছে ভাইবোনে হামলা চালিয়েছে। ভোঁদা নিচু ডাল থেকে পটাপট পেয়ারা ছিঁড়ে হাফপ্যান্টের পকেটে ঢোকাচ্ছে। ঝিমির হাতভর্তি পেয়ারা এবং পড়ে যাবে বলে হাতটা পেটের কাছে আটকে রেখেছে। অন্য হাতে পেয়ারা কামড়াচ্ছে। মুখটা উঁচু হয়ে গাছের দিকে।

হংসধ্বজ এসে কী বলবেন ভেবে ভীষণ উদ্বেগ হচ্ছিল।

নকুলেব বাড়ি কাছাকাছি। সে ঘুমোচ্ছিল। প্রথমে বেরিয়ে এল তার বউ। যেমন শুনেছিলাম তেমন কিছু নয়। তবে সে যুবতী এবং নকুলের মতো প্রেমিক যুবকের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। বুঝলাম, দুজনে সুখে ঘুমোচ্ছিল। কপালের টিপটা ঘষেও গেছে। আমাকে দেখে ঝটপট ঘোমটা টেনে তক্ষুনি ভেতরে চলে গেল। একটু পরে নকুল বেরিয়ে এল হাসিমুখে। এক্ষুনি যাব যাব করছিলাম মাস্টোমশাই।

বললাম, ফুলগাছগুলোর অবস্থা দেখ গে, নকুল।

নকুল চমকে উঠে বলল, সে কী। গরু ঢুকেছিল নাকি ?

উঁহু, মানুষ। তুমি এক্ষুনি এস নকুল। কারা সব এসেছে দেখ গে। হুলুস্থুল চলছে।

নকুল উদ্বিগ্নমুখে ব্যস্তভাবে হাঁটতে থাকল। বাড়ির কাছে গিয়ে বোসবাবুকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলেছে, মরেছে রে। আবার ওবারসিয়েরবাবু এসে হাজির হয়েছে।

উনি ওভারসিয়ার নাকি ?

আজ্ঞে। বনবিহারীবাবু নাম। সেবার দলবল নিয়ে এসে তিনদিন ছিলেন। তাতেই বাবুমশাইয়ের বাড়ি একেবারে কাত। নকুল ঝোপের আড়ালে উঁকি মেরে দেখে বলল ফের, দেখছ? ধেড়ে মেয়েটার কাণ্ড? পেয়ারাগাছে চেপে বসে আছে? উরে ব্বাস! সেই মামদোটাও এসেছে দেখছি।

বলে সে তেড়ে চলে গেল এই এই করতে করতে। বুঝলম নকুল ওদের ভয় পায় না। বনবিহারী নকুলকে দেখে খ্যাঁক করে হেসে বললেন, আয় নোকলো। নকুল গ্রাহ্য করল না। সোজা পেয়ারাগাছটার দিকে তেড়ে গেল।

ভোঁদা ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জটা বাগিয়ে ধরে বলল, কাছে এস না। দেব প্যাঁক করে চোখে বিঁধিয়ে।

নকুল আর্তনাদ করল, হায় হায়। করেছে কী দেখছ? বাবুমশাই জানতে পারলে কী হবে এখন?

আমার ঘরের জানালায় বোসগিন্নির মুখ দেখা গেল। নকুল নাকি রে? কেমন আছিস? আয়, আয়। এদিকে আয় তো ঝটপট। এঁটো হাঁড়িকুড়ো ধুয়ে দে। আয় তো বাবা।

নকুল হঠাৎ নরম হয়ে মুখ নামিয়ে সে খিড়কির দিকে চলে গেল। আমি পেয়ারা গাছটার কাছে গিয়ে বললাম, খোকা। এবার ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জটা আমাকে দাও তো।

ভোঁদা গাল মোটা করে বলল, খোকা কাকে বলছ? আমি দুধুভাত্তু খাই নাকি যে খোকা বলছ?

ঠিক আছে। ভোঁদা, কৈ—দাও তো ওটা।

ভোঁদা চিক্কুর ছেড়ে বলল, আমি সুবিমলচন্দ্র বোস।

ওক্কে। সুবিমলচন্দ্র বোস। দাও।

কী করবে, বলো?

ওর দিদি তখনও পেয়ারা গাছের ডালে বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, তোমার দিদিকে ইঞ্জেকশান দেব।

ঝিমি চেঁচিয়ে উঠল। শাট আপ। অচেনা লোকের জোক আমি লাইক করি না। বলে সে মুখখানা করুণ করে ফেলল। অ্যাই ভোঁদা। প্লিজ। আমাকে একটু ধর না। নামব।

ভোঁদা ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জটা আমার হাতে দিয়ে ফিসফিস করে প্ররোচনা দিল। দিন না। দিয়ে দিন না দিদির গায়ে প্যাঁক করে ফুটিয়ে।

ঝিমি কাকুতিমিনতি করে বলল, লক্ষ্মীভাই। সোনা আমার। একটু ধর

আমাকে।

ভোঁদা হি হি করে হেসে বলল, লাফ দে না। দে লাফ

এই সময় বনবিহারীর ডাক ভেসে এল ভোঁদু। ঝিমু। চলে এস সব। খাবে এস।

ভোঁদা নাক বরাবর ফুলগাছের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে গেল। রজনীগন্ধার ঝাড়গুলো শুইয়ে দিয়ে গেল। গাঁদা ফুলের ঝাড় ভেঙে পড়ল। দোপাটির ঝাড়টা মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা শ্বাস ছেড়ে ফুলগাছগুলো দাঁড় করানো যায় কিনা দেখতে পা বাড়ালাম। তখন ঝিমি ডাকল, এই। শুনুন।

ঘুরে বললাম, বলো—সরি, বলুন।

তুমি বললেও আমি মাইণ্ড করব না। আমাকে একটু নামিয়ে দেবেন?

কীভাবে নামাব?

ঝিমি একটু ভেবে বলল, আপনি ওখানে হাতটা দিয়ে রাখুন শক্ত করে। আমি পা রেখে নামব।

চোখ পাকিয়ে বললাম, তুমি জানো কি আমি ব্রাহ্মণ?

ঝিমি অবাক হয়ে বলল, তাতে কী হয়েছে?

আমার হাতে পা রাখবে বলছ।

ঝিমি হাসল। যাঃ। আজকাল ওসব চলে না। এই। প্লিজ। একটু হেল্প করুন না।

হাসতে হাসতে গাছটার গোড়ায় গিয়ে বললাম, কৈ—এস।

আহা। হাত দিয়ে নিচের ডালটা ধরুন—তবে তো।

তুমি আমার কাঁধে পা রেখেও নামতে পারো।

যাঃ। আমার পায়ে কাদা যে।

বুঝলাম, পায়ে কাদা না থাকলে তাই করত সে। নিচের ডালটা একটা হাতে চেপে ধরলাম। সে আলতোভাবে পা রেখে লাফ দিল এবং ঘাসে ধপাস করে পড়ল। পড়েই উঃ করে উঠল।

বললাম, লাগল নাকি?

নাঃ। বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে পেছনটা দুহাতে ঝাড়তে ঝাড়তে স্লিপার খুঁজল। তারপর দুহাতে তুলে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। গাছতলা জুড়ে অজস্র কাঁচা পেয়ারা ছড়িয়ে আছে। চিবুনো শাঁসও ছড়িয়ে আছে যথেচ্ছ। কাঁচা পেয়ারাগুলো একটা-একটা করে কুড়িয়ে নিচু পাঁচিলের ওধারে আগাছার জঙ্গলে ফেলে দিলাম। তারপর ফুলগাছগুলোর কাছে গেলাম।

কিছু করা গেল না অবশ্য। দেখলাম, হংসধ্বজের ঘরের ভেতর কী একটা চলছে। একটু পরে প্লেট হাতে বেরুলেন বনবিহারী। বেতের চেয়ারে বসে খেতে ব্যস্ত হলেন। সঙ্গে সন্দেশ-টন্দেশ এনেছেন বোধ করি। চায়ের কাপটা বেতের টেবিলে প্লেটে ঢাকা আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকলেন বনবিহারী।

ভাবলাম সন্দেশের ভাগ দেবেন। তা নয়। বললেন, দেশ কোথায় ?

আজ্ঞে, কাটোয়া।

টাউনে নাকি গ্রামে ?

টাউনে।

লেখাপড়া কদ্দুর।

সামান্যই।

আহা, শুনি ? বলতে দোষ কী ? এই দেখছেন আমাকে। আমি আই এস সি পাশ করে ওভারসিয়ারির ট্রেনিং নিয়ে রোড্‌স্ ডিপার্টে ঢুকেছি—তা বছর ষোল হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আপনার এজ কতো ?

ছাব্বিশ-টাব্বিশ হবে।

তাহলে তো আর গভমেন্ট সার্ভিসের আশা নেই ! কতদূর পড়াশোনা বললেন না ?

বি এ-টা পাশ করেছিলাম টেনেটুনে।

অনার্স ?

নাঃ !

বনবিহারী শেষ সন্দেশ কোঁত করে গিলে জল বলে হাঁক ছাড়লেন। ঝিমির মা জলের গ্লাস দিয়ে ব্যস্তভাবে চলে গেলেন ভেতরে। জল খেয়ে বনবিহারী বললেন, অনার্স ছাড়া বি এ-র কোনো ভ্যালুই নেই। তা হাঁসুদার কাছে কবে এসে জুটলেন ?

দিন কুড়ি হয়ে এল প্রায়।

বনবিহারী চায়ে চুমুক দিয়ে গোঁফ মুছে বললেন, হাঁসুদা এই করে খামোখা সারাজীবন পয়সাকড়ি ওড়াচ্ছে। যখন মাথায় যে খেয়াল চাপে, আর রক্ষে নেই। কোঅপারেটিভ করতে গিয়ে সেবার গচ্চা দিয়েছিল হাজার দুয়েক। আপনার মতো একজনকে রেখেছিল। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সে উধাও। আরেকবার জনকল্যাণ সমিতি না কী একটা করে দুবিঘে জমি বেচেছিল। তারপর মহিলা ত্রাণ হল। শেষে এখন অ্যাডাল্ট এডুকেশন। নিজের রোজগার

করা টাকা তো নয়। পৈতৃক সম্পত্তি। ওড়ালে কে বারণ করছে? বারণ করলে শুনবেই বা কেন? মাসে মাসে কতটাকা মাইনে দিচ্ছে আপনাকে?

ভদ্রলোকের কথাবার্তা অপমানজনক। কিন্তু গ্রাহ্য না করে টাকার অঙ্কটা বাড়িয়ে বললাম, আড়াইশো।

চোখ কপালে তুললেন বনবিহারী। আড়াই শো! টু হান্ড্রেড ফিফটি। নিশ্চয় গভর্মেন্ট গ্রান্ট পায়?

আজ্ঞে না। সরকারি কোনো সাহায্য নেন না।

বলেন কী মশাই? বনবিহারী নড়ে বসলেন। পকেট থেকে দিচ্ছে? নিশ্চয় একটা ইনসিওরেন্সের টাকা পেয়েছে। বলছিল বটে, সামনে বছর একটা ইনসিওরেন্স ম্যাচিওর করবে।

ভুরু কুঁচকে গুম হয়ে চা খেতে থাকলেন বনবিহারী। একটু পরে মুখ কাপের কাছে রেখে চশমার ওপর দিয়ে বললেন, টু হান্ড্রেড ফিফটি উইথ লজিং এবং ফুডিং?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে ফের গোঁফ মুছে বললেন, ব্রাহ্মণ সন্তান। বি এ পাশ। একটা কথা বলি শুনুন। হাঁসুদার বয়স হয়েছে। নেহাত আগের জেনারেশনের লোক বলে এখনও ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে এ বয়সে। আগের দিনে এখনকার মতো ভেজাল খেতে হত না। তার ওপর পাড়াগাঁয়ে থাকা। তো কথাটা হল, আর কদিন? এমনি করে সব টাকাকড়ি উড়িয়ে তারপর যখন একেবারে ইনভ্যালিড হবে, তখন? তখন কে ওকে দেখবে? আপনিও না, আমিও না। যতক্ষণ ফুলে মধু থাকে, ভোমরা এসে গুনগুন গুনগুন করে ঘোরে। মধু ফুরোলেই ব্যস!

হ্যা হ্যা করে হেসে বনবিহারী শেষ কথা বললেন, তাই বলি। ব্রাহ্মণ সন্তান। বি এ পাশ। কত জায়গায় কত সুযোগসুবিধে পাবেন। এজ পেরিয়েছে, ওটা কথা নয়। চেষ্টা থাকলে—

চলে যাব বলছেন?

বনবিহারী মাথা নেড়ে বললেন, আমি বলার কে মশাই? ইওর কনসেন্স। বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন। বিবেক তাই বলবে।... না, না। এসব প্রাইভেট—স্ট্রিক্টলি কনফিডেন্সিয়াল কথাবার্তা হাঁসুদার কাছে আলোচনা করতে যাবেন না যেন। আপনি ব্যাক গ্রাউণ্ডটা জানেন না। জানিয়ে দিলাম। এবার যা উচিত মনে হয়, করবেন। হাঁসুদা আমার নিজের লোক। বুকে বাজে বলেই

গোপনে আলোচনা করছি। নৈলে আমাব কী বলুন ? আমি এসেছি ছুটিতে বেড়াতে। ওরা বলল, ঝাঁপুইতলা চলো। কালীপুজো দেখে আসি গত বছরের মতো। খুব ধুমধামও হয়। তান্ত্রিক মতে পুজো। আগে তো নরবলিও হত। এখন হয় মোষ বলি।..

ভাঁটু মিস্ত্রি কখন এসে গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকল, মাস্টোমশাই ! সোজা ঘরে ঢুকে হংসধ্বজের লণ্ডভণ্ড বিছানাব পাশে যথাস্থানে সিরিঞ্জটা রেখে বেরিয়ে গিয়ে বাঁচলাম।..

পরদিন বিকেলে বাজারে হাইওয়েব বাসস্টপে ভাঁটু, নকুল আর আমি হংসধ্বজের কথামতো অপেক্ষা করছিলাম। ঝাঁপুইতলায় প্রচণ্ড ঢাক বাজছিল। বাজারেও খুব ভিড়। দলে দলে লোক আসছিল—সম্ভবত মোষবলি দেখতেই। হংসধ্বজকে নিয়ে বাসটা এল, তখন সূর্য ডুবে গেছে। গলগল করে লোক বেরুল একদঙ্গল। বাসটার আষ্টেপিষ্টে লোক। প্রায় ফাঁকা হয়ে গেলে হংসধ্বজ বেরুলেন। বেরিয়ে ব্যস্তভাবে বাসের অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে ছাদ থেকে 'মাল' নামাতে বললেন। তারপর আমাকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, চোখ ছানাবড়া করে দেব মুকুলের। হুই ! এলাহি কাণ্ড। বুঝলে তো ?

বাস থেকে একটা প্রকাণ্ড প্যাকিং বাক্‌সো নামানো হচ্ছিল। ভাঁটু ও নকুল সেটা ধরে নামাল। ভাঁটু বলল, হুঁঃ ! আমি ভাবলাম না জানি কত ওজন। শোলার মতো হাল্কা। জিনিসটা কী বাবুমশাই ?

বলব কেন ? ভেংচি কাটার ভঙ্গীতে বললেন হংসধ্বজ। তারপর আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, সব ঠিক আছে তো ?

আমি কিছু বলার আগে নকুল বলে উঠল, কেলেঙ্কাবি বাবুমশাই ! ওবারসিয়ের বাবু এসেছেন ছানাপোনা নিয়ে কালকে। সব নণ্ডভণ্ড কবে দিয়েছে। রাত্তিরে মাস্টোমশাইকেও ঘর থেকে বেদখল করে ছেড়েছে। বিছানা পর্যন্ত। শেষে বিছনা এনে দিলাম চির্মনির্দির্দির বাড়ি থেকে। আর কে দেবে ?

হংসধ্বজ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে শুনছিলেন। শুধু বললেন, হুঁ।

ভাঁটু বলল, সেন্টারে মশারি খাটিয়ে বিছনা করে দিয়েছিলাম।

নকুল বলল, কাল সেন্টাবে চা যায় নি। কেলাস ভেঙ্গে মাস্টোমশায়েব ভাত তরকারি আনতে গিয়ে দেখি, ওবারসিয়েবাবুব গিন্নি তাও রাখেনি। সবাই দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছিল। ডেকে ওঠালাম তো খুব বকাবকি করল। বললাম, মাস্টোমশাইয়ের ভাত ? বললেন, মনে নেই। শেষে –

ভাঁটু বলল, শেষে বাজারে এসে দেখি ঝাঁপ বন্ধ। ময়রাপিসিকে তুলে চিঁড়ে নাড়ুটাড়ু নিয়ে গেলাম। মাস্টোমশাইয়ের পিণ্ডি রক্ষে হল।

নকুল বলল, এই অবস্থা বাবুমশাই!

হংসধ্বজ মৃদুস্বরে বললেন, আজ দুপুরে কোথায় খেলে?

নকুল বলল, আজ দুপুরে আমাকে রাঁধতে দিয়েছিল। আমি টিফিংকেরিয়ারে করে সেন্টারে—

বাধা দিয়ে হংসধ্বজ বললেন, নে। মালটা ওঠা।

আমার কাঁধে হাত রেখে হাঁটছিলেন হংসধ্বজ। রাস্তায় পুজো দেখা লোকের ভিড় আজ। গ্রামটা থই থই করছে মানুষজনে। সদররাস্তা থেকে নিয়ে মোড় নিয়ে ছোট একটা রাস্তায় পৌঁছে বললেন, তাহলে তোমার ভীষণ অসুবিধে হয়েছে!

বললাম, না, না। ওসব আপনি ভাববেন না। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন হলে একটু অসুবিধে হয়েই থাকে।

হংসধ্বজ একটু পরে বললেন, একটা ম্যাজিকলণ্ঠন আনলাম। অ্যাডাল্ট এডুকেশনের ডজনতিনেক স্লাইড এনেছি। আরও তিনডজন অর্ডার দিয়ে এলাম। শিগগিরি পাঠিয়ে দেবে। তুমি যেসব সাজেশান দিয়েছিলে, সেইভাবে আঁকতে বলেছি। এখন সমস্যা হল, সেন্টারঅব্দি ইলেকট্রিক লাইন টানতে হবে বাড়ি থেকে। টাকা ফুরিয়ে গিয়ে তার কেনা হল না। ভাড়ায় পাওয়া যাবে সন্তোষের দোকানে। আজকের দিনটা থাক। কালীপুজো দেখবে সবাই। আগামীকাল ব্যবস্থা করা যাবে। কাল দেখবে কী ভিড় হয়। হিড়িক পড়ে যাবে।

হাসতে লাগলেন হংসধ্বজ।

বারান্দায় আলো জ্বালিয়ে একা বসে ছিলেন বনবিহারী। হংসধ্বজকে দেখে তড়াক করে উঠে লনের ঝাউয়ের সারির ভেতর এগিয়ে হেঁটমুণ্ডে পা দুটো ছুঁলেন। হংসধ্বজ তাঁর কাঁধে হাত রেখে ওঠালেন। কখন এলে সব? কেমন আছ তোমরা?

বনবিহারী বললেন, নিশ্চয় চিঠি পাননি, হাঁসুদা?

চিঠি? কৈ—না তো!

বনবিহারী কথা বলতে বলতে নিজের বাড়ি ঢোকানোর ভঙ্গীতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘরে ঢুকে হংসধ্বজ একটু দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, নকুল! ভাঁটু! এক কাজ কর বরং। মালটা পাশের ঘরে ঢোকা। মুকুল, চাবি নাও। ভেতরে সুইচ আছে দেখবে।

তালাবন্ধ ঘরটাতে কী আছে দেখিনি। তালা খুলে সুইচ হাতড়ে আলো জ্বেলে দেখলাম, কয়েকটা বোঝাই বস্তা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা আছে। কয়েকটা প্যাকিং বাকসো পড়ে আছে একপাশে। রেডক্রশের ছাপ আছে তাতে। একটা পুরনো সিন্দুকের ওপর প্রকাণ্ড কাপড়ের বোঁচকা রয়েছে। দেয়ালের থাককাটা কাঠের তাকে দুটো ফুলদানি, একটা গোটানো শতরঞ্জি, সাদা ভাঁজকরা চাদর, ভাঁজ করা গালিচা, জীর্ণ হ্যাজাগ। ম্যাজিকলণ্ঠনের প্রকাণ্ড প্যাকেটটা একপাশে রেখে নকুল বলল, দেখছেন বাবুমশাইয়ের কাণ্ড ? মিটিং ফাংশন—যা কিছু হোক, কারুর কাছে চাইতে যেতে হবে না। সব মজুত ঘরে। ফুল ? তাও নিজের বাগানের। আর ওই দেখুন, হারমুনিয়া ডুগিতবলা।

বলে চোখ নাচাল সে। ফিসফিস করে বলল, বলবেন বাবুমশাইকে। সেন্টারে একটু গানবাজানা হলে মন্দ কী ? আমি বললে তেড়ে আসেন। বলেন, নেকাপড়া নষ্ট হবে। তা কি হয় ? বলুন দিকিনি ?

তালা বন্ধ করে ওঘরে গেলাম। দেখলাম, হংসধ্বজ সব গোচ্ছাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, পুজো দেখতে বেরুবে তো ? সেই মাঝরাত্রে। এখন ইচ্ছে হলে একপাক ঘুরে আসতে পারো। তান্ত্রিক আচার সম্পর্কে এক্সপিরিয়েন্স হবে। প্রেপারেশন শুরু হয়ে গেছে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। অমাবস্যার লগ্ন এলে ঝাঁপুইতলার অন্যরূপ। ভাঁটু, নিয়ে যা তোদের মাস্টারমশাইকে। সকাল-সকাল ফিরে আসবি যেন। খেয়েদেয়ে ইচ্ছে হলে আবার বেরুবে। যা—ঘুরে আয়।

মনে হল, কোনো কারণে আমাকে কিছুক্ষণ সরে যেতে বলছেন। একটু উদ্বিগ্ন হলাম। ঝিমিদের ওপর কোপ পড়বে ভেবেই। তারা হয়তো পুজো দেখতে বেরিয়েছে।

সেন্টারে গিয়ে টর্চ নিলাম। আবার নতুন ব্যাটারি ভরতে হয়েছে। সেন্টারের দরজা-জানালাগুলো বসানো হয়েছে কোনরকমে। এখনও কাদার চাপ দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়নি। কাল-পরশুর মধ্যে একাজটা হয়ে যাবে। রাস্তায় গিয়ে ভাঁটুকে বললাম, নকুল কাল রাতে চিমনির কাছে বিছানা এনেছিল বলেনি।

ভাঁটু অন্ধকারে হাসল।...আর কোনো বাবুর বাড়ি চাইলে তো দেবে না। থাকলেও বলবে নেই। কিন্তু চিমনি ফেরাতে পারবে না জানতাম। তাই নকুলকে ওর কাছেই পাঠিয়েছিলাম।

আমিও হাসলাম। চিমনির বিছানায় শুয়ে ওর বাবার মতো পাগল হয়ে যাব না তো ?

ভাঁটু হেসে অস্থির হল।...আজ্ঞে না, না। বলবেন না। শুনলে মেয়েটা দুঃখু

পাবে। আমার মনে হয় কী, মেয়েটা—

সে থেমে গেলে বললাম, কী!

ভাঁটু চুপ করে গেল। অন্ধকার রাস্তায় আজ মাঝে মাঝে লোকজন দেখা যাচ্ছে। টর্চ জ্বলছে এখানে-ওখানে। গ্রামের মাঝামাঝি সদর রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে বাল্ব জ্বলছে। গাছপালার আড়ালে সেগুলো ঝিকমিক করছিল।

সেদিকে না গিয়ে ভাঁটু বাঁদিকে ঘুরল। চাপা গলায় বলল, চলুন বুড়োশিবের মন্দিরে যাই। কমলা ডাকনির সঙ্গে দেখা হতেও পারে। আজ রাত্তিরটা বলতে গেলে তারই।

কেন বলো তো?

বুঝলেন না? ভাঁটু অন্ধকারে একটা হাত চারদিকে ঘুরিয়ে তাব কথাকে ওজন দিতে চাইছিল। সে বলল, আর ঢাক বাজছে না কোথাও। নিশুতি সুমসাম মনে হচ্ছে। এখন এ রাতটা প্রিতিদিনের রাতের চেয়ে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে ক্রিমে-ক্রিমে। ক্যানে—কী মাকালীর জাগরণ হবে। তাকে জাগাতে রাজ্যের কালীসাধক এসে জুটেছে ঝাঁপুইতলায়। কিন্তু কমলি যে ডাকনি! মায়ের জাগরণ ডাকনি না ডাকলে হবে না।

কিন্তু শিবমন্দিরে সে কী করবে?

ভাঁটু অবাক হয়ে বলল, বামুনঠাকুরের ছেলে হয়েও সেটা জানেন না? বাবা মহাদেব যে মাকালীর বর। পায়ের তলায় ন্যাংটো হয়ে পড়ে আছেন না তিনি? মা আসছেন ভয়ঙ্করী হয়ে রক্ত খেতে খেতে। তাব আগে মহাদেবকে জাগাতে হবে না? জাগলে পরে তবে তো শিব গিয়ে সামনে পডবেন। তার বুকে পা পড়তেই রক্তখাকী মায়ের লজ্জা হবে। একহাত জিভ বের করে থমকে যাবেন। চ্ছিস্টি রক্ষে পাবে।

এটাই তাহলে কালীপুজো সম্পর্কে ঝাঁপুইতলার তত্ত্ব। ভাঁটু চাপা গলায় এইসব তত্ত্ব বলতে বলতে গ্রামের শেষদিকটায় নিয়ে গেল। এদিকটায় বাঁজা ডাঙ্গা আর তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য তালগাছ। একটা হাতের তালুর মতো ঝকমকে চটানের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, আর লাইট জ্বালবেন না!

কালো টিলার মতো দেখাচ্ছিল গাছপালার জটলাকে। ভাঁটু পা বাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, লুকিয়ে 'সাধন-ঠিকন' এসব দেখা পাপ। তবে আপনি বাম্মন ঠাকুর। পাপ খণ্ডে যাবে। আসুন।

এইসময় অন্ধকারে কালো একটা মূর্তি আমাদের সামনে দিয়ে ধুপধুপ শব্দে দৌড়ে গেল। চমকে উঠে টর্চ জ্বেলে ফেলেছিলাম প্রায়। ভাঁটু আমাকে ছুঁয়ে

ইশারায় বারণ করল। ফিসফিস করে বলল, ঠিকন-ঠাকন করতে যাচ্ছে কেউ। পরনে একফালি বস্তরও নেইকো। বোধ করি পদ্মপুকুরের 'গাভায়' (গর্ভে) যাচ্ছে। মেয়েছেলেও হতে পারে বৈকি। অমাবস্যের লগ্নটি যেই আসবে জীবের গলায় পড়বে খাঁড়ার কোপ। আর ঢাকগুলান বেজে উঠবে সঙ্গেসঙ্গে। ব্যস, ঠিকন-ঠাকন সাধন-ভজন শুরু হবে।

জিগ্যেস করলাম, কারা এসব করে?

আছে। ভাঁটু ফিসফিস করে বলল। তবে বেশির ভাগই বাগদি, বাউরি, কুড়র, ডোম—আপনার গিয়ে বায়েন, হাড়ি, চাঁড়াল, এসব জেতের লোক। বউঝিরাও আছে। আবার মোচলমানও আছে কেউ কেউ। আশপাশের গাঁ থেকেও এসেছে, আবার ঝাঁপুইতলারও আছে। মণিঠাকুর বলে একজন আছে। সে তো বড় সাধক।

কেন এসব করে ওরা, ভাঁটু?

ভাঁটু আবাব দাঁড়িয়ে গেল। বলল, মনোবাসনা পুন্ন হয়। তবে আর কথা বলা ঠিক নয়। 'লোক' (চুপ) করে আসুন।

ভাঁটু অন্ধকারেও দেখতে পায়। কিন্তু আমার আতঙ্ক পায়ে পায়ে শুধু সাপের। ধনোর সাপের কামড়ে মৃত্যু দেখাব পর রাতবিরেতে পা ফেলতে বারবার শিউরে উঠি। আলো ছাড়া বেরুনোর কথা কল্পনাও করি না। এখন মনে হচ্ছিল, ভাঁটুর সঙ্গে না এলেও পারতাম। প্রকাণ্ড বটগাছের ঝুরির ভেতরে দিয়ে এগিয়ে ভাঁটু ফিসফিস করে বলল, শুনতে পাচ্ছেন?

এতক্ষণে কানে এল অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে কেউ কিছু আবৃত্তি করছে। একটু পরে বুঝতে পারলাম কণ্ঠস্বরটা পুরুষের। ভাঁটু আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, মণিঠাকুর। ঠাওর করে দেখুন, দুজন আছে।

ক্রমশ দৃষ্টি একটু পরিশ্রুত হল অন্ধকারে। একটা আবছা মন্দির দেখা যাচ্ছিল। তার উঁচু এবং খোলা এক টুকরো বারান্দামতো জায়গায় কারা মুখোমুখি বসে আছে। একটু পরে নিচের প্রাঙ্গণে কেউ এসে দাঁড়াল এবং চাপা গলায় ডাকল, ঠাকুরমশাই!

ভাঁটু আমাকে ছুঁয়ে উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করল, যুগী! যুগী ডোম!

যোগী গুণিন বলল, সিঁদুর এনেছি।

মণিঠাকুর বলল, কৈ দে। দিয়ে বোস চুপচাপ।

যোগী বলল, বরঞ্চ একপাক ঘুরে আসি রায়তলা হয়ে।

যা। সময়মতো আসিস যেন। না এলে আমার কাঁচকলাটি। তোদের পুজো

তোবা বুঝবি।

যোগীর ছায়ামূর্তি আমাদের একটু তফাত দিয়ে চলে গেল। তারপর ভাঁটু ফিসফিস করল, ঠাকুরমশায়েব ছামুতে বসে আছে কমলা ডোমনি। কিছু বোঝা যায় না।

মণিঠাকুর আবার খুব চাপা গলায় দুর্বোধ্য অং বং আওড়াতে থাকল। আবও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পব ভাঁটুকে ইশারায় জানিয়ে দিলাম, ফেরা যাক।

ভাঁটু অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল। চটান পেরিয়ে গ্রামে ঢোকার মুখে সে বলল, আমার কেমন একটা সন্দ লাগছে। গুণিনরা মাগমরদে এসেছে, উদিকে মণিঠাকুর। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

এবাব আমরা গ্রামের সদররাস্তায় গেলাম। মেজবাবুদের ঠাকুবদালানের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। বাইরে একটা মেলাও বসে গেছে। মোষ বলিটা এখানেই হবে। ভিড়ে আর ঢুকলাম না। ভাঁটু বলল, সাতখানা ঠাকুর হয় ঝাঁপুইতলায়। এই ঠাকুরের নাম বড রায। যুগী রায়তলা বলল, সে হল এই রায়। বরঞ্চ চলুন, শ্যামবায়তলায় যাই। খোলা জায়গায় ঠাকুর হয়।

পা বাড়াতেই বোসগিন্নি, ঝিমি আর ভোঁদার সঙ্গে দেখা। বোসগিন্নি চিনতে পারেননি। কিন্তু ঝিমি চিনতে পেরে বলল, আমাদের সব দেখা হয়ে গেল। আবার দেখতে আসব পুজোব সময়।

বোসগিন্নি ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখছিলেন। শালখুঁটিব মাথায় বাল্ব জ্বলছে। কম আলোতে ভাল করে আমাকে দেখতে চেষ্টা করে শেষে বললেন, ও। হ্যাঁ গো ছেলে, ভাসুরমশাই ফিরেছেন কলকাতা থেকে?

বললাম, হ্যাঁ। সন্ধ্যাব আগেই ফিরেছেন।

বোসগিন্নি মেয়ে এবং ছেলেকে বেড দিয়ে বললেন, চলচল্! খুব হয়েছে। তোদের জ্যাঠামশাইয়ের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝিমি মুখে মিনতি ফুটিয়ে বলল, ও মা! আমরা পরে যাব। তুমি যাও না!

বোসগিন্নি ধমক দিলেন, আবার কী?

ঝিমি ভোঁদাকে টেনে বলল, ভ্যাট! এলাম তো পুজো দেখতে। বাড়ি বসে থাকতে নাকি?

পুজো কি এখন? রাত বারোটায়। চলে আয় বলছি!

ভোঁদা পিছিয়ে গিয়ে গাল মোটা করে বলল, আমি বলেছি—মোষবলি দেখব, তবে যাব।

বোসগিন্নি বললেন, মরো তাহলে। আমি চললাম। আয় ঝিমি!

ঝিমি আমার দিকে একবার এবং মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, তুমি যাও না মা ! আমি আর ভোঁদা একেবারে পুজো দেখে যাব। এই তো নকুলদা আছে। নকুলদার সঙ্গে—

দ্রুত বললাম, আমি নকুল নই কিন্তু।

ঝিমি ফিক করে হেসে বলল, সরি ! মুকুলবাবু না আপনার নাম ?

বোসগিন্নি চটে গিয়ে বললেন, না। ও যাবে না। ওগো ছেলে, এস তো একবারটি ! আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবে। ওদিকটায় যা আঁধার আর জলকাদা। তোমার হাতে টর্চ আছে। আলো দেখিয়ে পৌঁছে দেবে। এস।

ভাঁটু ঝিমিকে বলল, মায়ের কথা শুনতে হয়। পুজোর তো অনেক দেরি। একটু পরে একটা-দুটো করে শয়ে শয়ে মাতাল বেরুবে। তখন মেয়েছেলেদের নিয়ে সমিস্যে। বুঝলেন না ?

বোসগিন্নি চোখ বড় করে বললেন, ওই শোন। মাতাল বেরুবে। চলে আয়।

ঝিমির নিশ্চয় মাতালকে বড় ভয়। সে মায়ের সঙ্গ ধরল। ভোঁদা গোঁ ধরে একটু দাঁড়িয়ে থেকে হি হি করে হেসে মাতালের ভান করে টলতে টলতে ঝিমিকে ধরতে এল। ঝিমি চেঁচিয়ে উঠল, মেরে ফ্ল্যাট করে দেব বলে দিচ্ছি।

ভাঁটু মুখটা একটু বেজার করে বলল, ঠিক আছে মাস্টোমশাই ! আপনি গিয়ে সেন্টারে রেডি থাকবেন। আমি দুমুঠো মুখে দিয়ে আসি এই ফাঁকে।

আমি আগে এবং পেছনে বোসগিন্নি, তাঁর পেছনে ভাইবোন পাশাপাশি হাঁটছিল। ছোট রাস্তায় পৌঁছে সত্যিই মাতালের জড়ানো গলার গান শোনা গেল। ঝিমি ছিটকে এসে ওর মাকে জড়িয়ে ধরল। ভোঁদাও ভয় পেয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। মাতাল লোকটি এসব গ্রাহ্যও করল না। কয়েকহাত তফাত দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

হংসধ্বজের বাড়ির গেটে ওদের পৌঁছে দিয়ে বারোয়ারি তলার যেতেই আচমকা শুনতে পেলাম, বসন্তো ! বসন্তো—ও ! বসন্তো—ও—ও !

চিমনির বাবা তাহলে ফিরে এসেছেন। টর্চের আলোয় দেখলাম। বারোয়ারিতলা ফাঁকা আজ। বসোবাবু সেন্টারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বসন্তকে ডাকাডাকি করছেন। মুঠো পাকিয়ে শ্লোগান দেওয়ার ভঙ্গীতে লম্ফঝম্ফ করছেন।

টর্চ নিবিয়ে দিলাম। মাতালের পাল্লায় পড়ার চেয়ে পাগলের পাল্লায় পড়া বেশি বিপজ্জনক। কী করব ভাবছি, সেইসময় সেন্টার থেকে কেউ বসোবাবুকে সাড়া দিয়ে বলল, কী ? কী বলছ ?

বসোবাবু বললেন, বসন্ত নাকি হে ?

কেউ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ ! তুমি কে হে ?

আমি পাঁচু—পাঁচুগোপাল মিত্তির।

সে আবার কে ?

ন্যাকা ! বলে বসোবাবু এগিয়ে গেলেন সেন্টারের দিকে। আমি বারোয়ারিতলার বেদীতে বসে পড়লাম। এই তামাশা কদ্দূর গড়ায় দেখা যাক।

বসোবাবু তখন খুঁজছেন 'বসন্তকে'। লোকটা লুকিয়ে গেল নাকি। বসোবাবু তাকে খুঁজে না পেয়ে অশ্লীল গাল দিতে শুরু করলেন। শাসাতে থাকলেন। লুকিয়ে গেল কেন বসন্ত—মুখোমুখি হবার সাধ্যি আছে ওর ? পাঁচুগোপাল তার মুণ্ডটা কড়মড় করে চিবিয়ে খাবে না ? মায়ের থানে আজ রাতে তাকে বলি না দিয়ে ছাড়বে ?

একটু পরে হংসধ্বজের বাড়ির পেছনে সেই আগাছার বন থেকে একটা আলো ফুঁড়ে বেরুল। আলোটা লণ্ঠন। দুলতে দুলতে এগিয়ে এল বারোয়ারিতলার দিকে। বসোবাবু তখনও বসন্তের নামে অকথা খিস্তি করে চলেছেন।

লণ্ঠনটা আবও একটু কাছে এলে দেখি, চিমনি। ডাকলাম, কুন্তলা !

চিমনি চমকে উঠে আলো তুলে আমাকে দেখল। কিন্তু কোন কথা বলল না। তার হাতে সেই কঞ্চিটাও আছে দেখলাম। সে হন হন করে এগিয়ে তার বাবার পেছনের দিকে ছিপটি মারল। বসোবাবু শুধু বললেন, আঃ। কী করিস মাইরি। এখন ইয়ার্কি ভাল্লাগে না।

চিমনি ছিপটি মারতে থাকল ক্রমাগত। বসোবাবু এবার আর্তনাদ করছিলেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও চিমনি ক্ষান্ত হল না। তখন আর বসে থাকতে পারলাম না। দৌড়ে গিয়ে ওর ছিপটিটা ধরে ফেললাম। চিমনি গর্জন করল, ছাড়ুন।

ছিপটিটা কেড়ে নিতে অনেকখানি জোর লাগল। চিমনির গায়ে এত জোর আছে বুঝতে পারিনি।

ছিপটিটা কেড়ে নিলে সে তখনই হন হন করে চলে গেল। লণ্ঠন নিয়ে ডাকলাম, কুন্তলা ! শোনো—কুন্তলা ! প্লিজ !

চিমনি পিছু ফিরল না। বসোবাবু উঠে বসে ভাঙা গলায় বললেন, তুই আবার কেরে ?

বললাম, উঠুন বসোবাবু !

তুই কোন লাটের বাটা যে উঠতে হুকুম করছিস ?

সিগারেট খাবেন ?

বসোবাবু এবার ঝটপট উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেট দিয়ে জ্বেলে দিলাম। ফুকফুক করে টানতে টানতে বললেন, মেয়েটা কে রে ? খালি মারে। কে—চিনিস ?

বসন্তবাবুর মেয়ে কুন্তলা।

ওই বল। হারামজাদিকে বলি দিলে কেমন হয় ? ষড়যন্ত্রের ভঙ্গীতে চাপা গলায় বললেন বসোবাবু। এই ঝাপুইতলার জমিদাররা নরবলি দিত, জানিস ? আইনে আটকায় বলে মোষ বলি দিচ্ছে। বড়বায় অনেককাল হিউম্যান ব্লাড খেতে পায়নি। জিভ লকলক করছে—মাইরি ' আমাকে একটু হেল্প কর না ! তুই মেয়েটাকে ধরে হাড়িকাঠে ভরবি। আর ঘ্যাচাং করে এক কোপে—

দুহাত তুলে নাচতে থাকলেন বসোবাবু। মুখে ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ডাং।

চলুন, বসোবাবু, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

দুস ' আমার বাড়ি আছে নাকি ?

আছে। চলুন আমার সঙ্গে।

বসোবাবু বেঁকে দাঁড়ালেন। কাজের কথা যেটা বলছি, তাতে কান নেই। আবোলতাবোল খালি।

বেশ তো, চলুন তাহলে। বসন্তবাবুর মেয়েকে ধরে নিয়ে আসি।

বসোবাবু লাফিয়ে উঠলেন। চক্রান্ত করতে করতে হাঁটতে থাকলেন আমার আগে-আগে। হংসধ্বজের বাড়িতে গান গাইছিল কেউ। ঝিমি ছাড়া আর কে ? হারমোনিয়ামও বাজছিল। একটু অবাক লাগল। তাহলে হংসধ্বজ ওই উৎপাত মেনে নিয়েছেন—মেনে নিতে অভ্যস্ত সম্ভবত।

আগাছার বনের ভেতর পায়ে চলা রাস্তায় টর্চের আলো ফেলে হাঁটছিলাম। বনটা পেরিয়ে নিচু পোড়ো জমির একপাশে কয়েকটা ইঁটের বাড়ি। বিদ্যুৎ জ্বলছিল। পেছনের একটা দোতলা বাড়ির কার্নিশে সারসার অসংখ্য প্রদীপ।

এপথে চিমনিদের বাড়ি এত কাছে জানতাম না। বাড়ির কাছে গিয়ে বসোবাবু আমার পেছনে চলে এলেন। ফিসফিস করে বললেন, তুই গিয়ে শক্ত করে ধরবি। ওর গায়ে অসম্ভব জোর কিন্তু। কলকাতার স্কুলে পড়ার সময় হাইজাম্প লংজাম্প দিয়ে ফার্স্ট হত। সাংঘাতিক মেয়ে।

বারান্দায় হেরিকেন রেখে চিমনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকলাম, কুন্তলা !

চিমনি আস্তে বলল, কী?

তোমার বাবাকে নিয়ে এসেছি।

অমনি বসোবাবু 'ওরে শালা বিশ্বাসঘাতক' বলে চোখের পলকে অন্ধকারে মিশে গেলেন। টর্চ জ্বেলে শুধু নড়বড়ে পা দেখতে পেলাম ধ্বংসস্তূপের আড়ালে।

চিমনি ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে দৌড়ে ঘরে ঢুকল। তার কান্না শুনতে পেলাম। এমন বুকভাঙ্গা কান্না—কোনো মেয়ের, আমি শুনিনি কখনও।

একটু দ্বিধা হচ্ছিল। ঝেড়ে ফেলে বারান্দায় উঠলাম। হেরিকেনটা তুলে নিয়ে গিয়ে দরজার সামান্য ভেতরে মেঝেয় রেখে ডাকলাম, কুন্তলা! শোনো!

ঘরের ভেতর একটা সামান্য তক্তাপোষে গুটিয়ে রাখা বিছানা। একটা শাদা ধবধবে নেটের মশারি শিয়রে ঝুলে আছে। দেয়ালের তাকে দুটো সুন্দর স্যুটকেস। তাদের কলকাতা-জীবনের কিছু নিদর্শন। ঘরের দেয়ালে পলেস্তারা চটে গেছে। জলপড়ার ছাপ ছাদে ও দেয়ালের ওপর দিকে। তবু ঘরটা সুন্দর করে সাজানো।

চিমনি গুটোনো বিছানায় মাথা লুটিয়ে কাঁদছিল। শরীরের অর্ধেকটা ঝুলছিল তক্তাপোষ থেকে। আমার ডাক শুনেই সঙ্গে সঙ্গে তার কান্না থেমে গেল। সোজা হয়ে বসে বুকের কাছ থেকে শাড়ি একটু তুলে চোখ মুছতে থাকল। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, পুজো দেখতে যাবেন না?

হয়তো যাব। যাবে তুমি?

সে মাথাটা দোলাল শুধু।

আচ্ছা কুন্তলা, তুমি কি মনে করো, ছিপটি মেরে বাবাকে সুস্থ করা যাবে? ব্যাপারটা ভীষণ খারাপ লেগেছে আমার। কেন তুমি—

চিমনি আমাকে বাধা দিয়ে মৃদু স্বরে বলল, একটা কথা বলব আপনাকে?

কী—বলো।

আপনি এমন করে কখনও আমার বাড়ি আসবেন না।

ও! আচ্ছা।

আমাকে ভুল বুঝবেন না প্লিজ! এটা পাড়াগাঁ।

না, না। তুমি ঠিকই বলেছ। এটা ভেবে দেখা উচিত ছিল।

আমি দরজার কাছে থেকে সরে এলাম। উঠোনে নেমেছি, চিমনি ধরা গলায় ডাকল, মুকুলদা! শুনুন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, বলো।

আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না যেন।

না কুন্তলা। আমি একটুও রাগ করিনি। আচ্ছা, চলি।

ফেরার পথে অনেক দূরে অন্ধকারে আবার বসোবাবুর চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। বসন্তো! বসন্তো—ও! বসন্তো—ও। অন্ধকার পৃথিবী তোলপাড় করে এক 'পাঁচুগোপাল মিত্তির' এক 'বসন্তকে' খুঁজে বেড়াচ্ছে। ডাকটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ আমার মাথার খুলির ভেতর কী একটা গড়িয়ে গেল। কোনো বোধের পতন? সবকিছু বিস্বাদ আর ব্যর্থ মনে হচ্ছিল।

সেন্টারে ফিরে দেখি লণ্ঠন জ্বলছে। সহদেব নামে এক ছাত্র বসে আছে আমার অপেক্ষায়। সহদেব সম্পন্ন গৃহস্থ। বয়স তিরিশের ওপারে। জাতিতে সে গোপ। একদঙ্গল গোরু-মোষ আছে তার। কিছু জমিজমাও আছে। আপনমনে বর্ণবোধের পড়া আওড়াচ্ছিল বিড়বিড় করে। আমাকে দেখে বই বন্ধ করে সলজ্জ হাসল। হাত জোড় করে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল।

বললাম, কী ব্যাপার! তুমি পড়তে এসেছ নাকি?

সহদেব জোরে মাথা দুলিয়ে বলল আজ্ঞে না। ভাঁটুকাকা বললে, সেন্টারে হেরকেনটা জ্বেলে দিবি মাস্টোমশাইকে। লোকজন তো হাঁসুবাবুর বাড়ির কুটুম নিয়ে ব্যস্ত, তাই এলাম। এসে দেখি আপনি নেই। আর---

বলে সে তাক থেকে একটা প্রকাণ্ড পেতলের রেকাব আনল। শালপাতায় মোড়া কী আছে তাতে। জিগেস করলাম, কী এনেছ সহদেব? আবার একগাদা ছানা নাকি? ছানা আমি খেতে ভালবাসি না তা তো জানো।

সহদেব বলল, না না। নুচি বোঁদে আর তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছে ভাঁটুকাকা। বলেছে খেয়েদেয়ে রেডি হয়ে থাকুন। পুজো দেখতে যাবে আপনাকে নিয়ে।

সহদেব, আমি ওসব খাব না।

সহদেব আর্তনাদ করল, সে কী! ক্যানে মাস্টোমশাই! আমার ছোঁয়া লেগেছে বলে? আমাদের গোপের ছোঁয়া তো ঠাকুরমশাইরা খায়। তাছাড়া দুধ-ছানাটা এনেছি। আপনি খেতে আপত্তি করেননি। তাই—

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, না সহদেব। আমার পেটের অবস্থা খারাপ। রাত্তিরে কিছু খাবনা।

সহদেব খুব মনমরা হয়ে গেল। নুচি-বোঁদে-তরকারিটা ভাঁটু পাঠিয়েছে বামুনবাড়ি থেকেই। সে সন্দিগ্ধভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকল। সরলা ঠাকরুন

থাকে ভাঁটুর বাড়ির পাশেই। আজ কালীপুজোর দিন বলে ভাঁটুর এই বিশেষ আয়োজন। আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিল কথাটা। তার ইচ্ছে ছিল ঠাকরুনের বাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে। কিন্তু আজ ঠাকরুন কী ব্রত করেছে। তাই বাড়ি থেকে তাকে বেরুতেই হবে। অগত্যা ভাঁটু সহদেবকে ডেকে খাবারটা পাঠিয়ে দিয়েছে। সহদেব এও বলল, গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি এবং ঘিটা তার বাড়ি থেকেই গেছে। আর তরকারি শুনে মাস্টোমশাই যা ভাবছে, তা নয়। ওটা মাংস। শালপাতার ঠোঙায় ঝোলসুদ্ধ সাবধানে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে রেকাবে। আজ সারা ঝাঁপুইতলা মাংস খাবে। কাল তো আরও খাবে। তার ওপর আজ 'কারণের' রাত। শয়ে শয়ে মাতাল বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণ। পথে পথে মাতাল।

আমার কান শুনছিল, মন শুনছিল না। মনে চিমনির কথাটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ভেবেছিলাম, চিমনি খুব বেপরোয়া মেয়ে। বুঝতে ভুল করেছিলাম তাহলে। মাঝে মাঝে রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর। আমি কি চিমনিকে ভালবেসে ফেলেছি যে ওই কথাটি শুনে মাথাখারাপ করে ফেলতে হবে? অথচ একটা ব্যর্থতার বোধ খুলির ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে পোকার মতো সরু সরু দাঁতে।

সহদেব বসে থাকতে থাকতে নকুল খাওয়ার জন্য ডাকতে এল। তারপর সহদেবের কাছে সব শুনে বলল, চিন্তা কী? বাবুমশাইকে যেয়ে বলি। ওষুধ দেবেন।

বারণ করার আগেই সে দৌড়ে চলে গেল। তার একটু পরে ভাঁটু মিস্ত্রি হাজির। থপ থপ করে পা ফেলে এসে সে বলল, নকুল বলল দাস্তবমি হয়ে হঠাৎ। সব্বোনাশ, সব্বোনাশ!

বেগতিক দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলো ভাঁটু। বেরোনো যাক আবার। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে।

ভাঁটু দুঃখিত মুখে বলল, এই শরীলে বেরুবেন? নকুল ওষুধ আনতে গেল হাঁসুবাবুর কাছে।

ওর কাঁধে হাত রেখে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললাম। সহদেব বসে রইল হেরিকেন নিয়ে। ভাঁটু ভেবেছিল জৈব তাগিদে এমন করে হেঁটে যাচ্ছি। বলল, ওখানে জল আছে।

কোনো কথা বললাম না। আর বেরুনোর একটুও ইচ্ছে ছিল না। এই গাঢ় অন্ধকারে চাপা একটা উত্তেজনা চনমন করছিল সন্ধ্যা থেকে। ঝাঁপুইতলা জুড়ে

বিশাল একটা আয়োজনের সঙ্গে নিজেকেও হয়তো জড়িয়ে ফেলেছিলাম অজান্তে। একটা বিস্ফোরণের মতো কোলাহলের আশা ছিল। কিছু একটা ঘটত যেন। অথচ এখন অন্ধকারটাই নিষ্ফল হয়ে গেছে। ভাবি একটা স্তব্ধতা চেপে বসেছে চারদিকে।

তাহলে কোথায় যাচ্ছি? কেনই বা যাচ্ছি? ভাঁটুর একটা হাত হাতে নিয়ে বললাম, আমার পেটের অসুখ হয়নি। ও নিয়ে তুমি ভেবো না। শুধু আমাকে একটা কথা বলো তো ভাঁটু?

ভাঁটু দাঁড়িয়ে গেল। কী মাস্টোমশাই?

চিমনিদের বাড়ি যাওয়া নিয়ে কোনো কথা উঠেছে?

ভাঁটু চমক খাওয়া গলায় বলল, ক্যানে? কিছু বলল নাকি কেউ?

না। কেউ বলেনি। আমার মনে হচ্ছে।

ভাঁটু খাপ্পা হয়ে বলল, যদি মন্দ কিছু রটায় তো রটাবে ওই হেঁপো কায়েত। কিন্তু আপনি তো মাত্তর দুবার গেছেন—সেও আমি সঙ্গে করে নিয়ে গেছি।

তুমি কিছু শোনো নি?

না তো। আপনাকে কে বাজে কথাটা বলেছে, বলুন দিকিনি? ভাঁটু জেদ ধরল। পস্টাপস্টি বলুন। তার সঙ্গে আজই রাতে বোঝাবুঝিটা হয়ে যাবে ভালমতো।

ছাড়ো ওসব কথা। বরং চলো, তোমাদের ডাকিনীর কীর্তি দেখে আসি।

বলবেন না মাস্টোমশাই?

আহা, ওসব থাক। চলো, সেই শিবমন্দিরে যাই।

ভাঁটু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, বুঝেছি।

কী বুঝেছ তুমি?

ভাঁটু বলল, চিমনি নিজেই বলেছে, তা হলে। নিশ্চয় কিছু কানে এসেছে।

সেকথায় কান না দিয়ে বললাম, আচ্ছা ভাঁটু, কোনো মেয়ে—মানে ভদ্রবংশের লেখাপড়া জানা মেয়ে নিজের বাবাকে ছিপটি মরতে পারে দেখেছ কখনও? নিজের বাবা, ভাঁটু। যে তাকে জন্ম দিয়েছে।

নিজেই অবাক হয়ে নিজের উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম। ভাঁটু কিন্তু অবাক হল না। বলল, ভাবলে পরে খুব খারাপ লাগে বটে। কিন্তু বসোবাবুর সব ব্যাপার বোধ করি আপনি দ্যাখেননি। মুখখিস্তি যা করার করে; পাগলে তা করেই থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের মেয়ের নাম ধরে যা সব বলে, কানে শোনা যায় না। রাস্তাঘাটে চেঁচিয়ে বলে, তোরা শোন রে। বসন্তোর মেয়ে এই করেছে, ওই

করেছে—ছিঃ।

ওঁকে বাড়িতে বেঁধে রাখলেই পারে চিমনি।

ভাট্টু হাসল। বেঁধে রাখলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মেয়েব নামে 'ভাট' গাইবে। কানে আঙুল দিয়ে চিমনি পালিয়ে যায় বাড়ি ছেড়ে। তার চেয়ে ছাড়া ঘুরে বেড়াক। মাস্টোমশাই, অনেক দুঃখে বাবার গায়ে হাত ওঠায় মেয়েটা। ক্যানে—কী, ভাবে, মারধর খেয়ে যদি পাগলামিটা সেরে যায়।

আমরা ডাকিনী দেখতে যাচ্ছি তো ভাঁট্টু?

আবার কোথা?

বাঁজা ডাঙ্গার তালগাছগুলো নক্ষত্রোজ্জ্বল আকাশের গায়ে কালো কালো থামের মতো দেখাচ্ছিল। চটান পেবিয়ে বটতলায় পৌঁছে চাপাগলায় কথাবার্তা শোনা গেল। ভাঁট্টু তখনকার মতো ইশারায় আমাকে চুপচাপ থাকতে বলল। ঝুরির আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি, মন্দিরের ভেতরে শিবলিঙ্গের নিচে মিটমিটে পিদিম জ্বলছে। সে আলো বাইরে বিশেষ আসছে না। উঁচু অপরিসর বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আছে জটাচুলো একটা লোক। তার মুখের একটা পাশে ছটা পড়েছে। তার পায়ের কাছে কালো কালো দুটো মূর্তি। জটাচুলো লোকটা তা হলে তান্ত্রিক মণিঠাকুর। সে চাপা গলায় বলল ঢুকিয়ে রেখে দে। এখনও দেরি আছে।

নিচের একটা কালো মূর্তি বলল, আরও খানিক কারণ ঢেলে দিই ঠাকুর মশাই। মাগি বড্ড হাতপা ছুঁড়ছে।

তান্ত্রিক বলল, দে দে। ধরব নাকি?

ধরুন। কামড়ে দিচ্ছে।

তান্ত্রিক ঝুঁকে গেল। এবার স্পষ্ট কমলার গলা শুনতে পেলাম। জড়ানো গলায় মাতলামি করে উঠল। অশ্রাব্য খিস্তিও। কঁক কঁক করে অদ্ভুত শব্দ হল। জোর করে মদ গেলাচ্ছে মেয়েটাকে। ভাঁট্টুকে একটু খোঁচা দিলাম। সে ফিসফিসিয়ে উঠল, কী হচ্ছে বলুন দিকিনি?

তান্ত্রিকের কথা শোনা গেল আবার। হ্যাঁ—হ্যাঁ। এবার মুণ্ডুটা ঢোকা। পা দুটো বেঁধে দে।

আপনি সুদ্ধু ধরুন।

ধুর ব্যাটা। অকম্মার ধাড়ি। ধর, চুল টেনে ধর মাগির।

কমলা আবার জড়ানো গলায় খিস্তি করে উঠল। তারপর তার হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কান্না, তারপর যেন গোঙ্গানি ভেসে এল। তান্ত্রিক বলল, এখনও দেরি

আছে। পড়ে থাক। বড়রায়তলায় ঢাক বাজলেই ঘ্যাচাং। হেঁ হেঁ হেঁ।

খুব যে নাফাচ্ছে ঠাকুরমশাই। ডাকনিটা ফিরে এসছে মনে হয়। এত জোর ক্যানে?

ঠ্যাঙের ওপর চেপে বোস্ ব্যাটা।

আমার হাত পা থরথর করে কাঁপছিল। ওরা কি কমলাকে বলি দেবে? কমলা ফের গোঙ্গিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটু তার পাঁচ ব্যাটারি টর্চ জ্বেলে ছিটকে বেরিয়ে গেল। আমিও টর্চ জ্বেলে দৌড়ে গেলাম। ভাঁটুর হাতে একটা লাঠি ছিল। টর্চের আলোয় যা দেখলাম বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল।

তান্ত্রিক মণিঠাকুর হকচকিয়ে গিয়েছিল। ভাঁটুর লাঠি তার কাঁধে পড়তেই বাপ রে বলে বিকট আর্তনাদ করে পড়ে গেল। পড়েই স্প্রিংয়ের মতো উঠে মন্দিরের পেছনে উধাও হয়ে গেল।

ভাঁটু গর্জন করল, অ্যাই শালা যুগী।

যোগী গুণিন পালাতে যাচ্ছিল। ভাঁটু তার জটা খামচে ধরে বলল, চল শালা, ফাঁড়িতে নিয়ে যাই। মানুষ খুন করতে যাচ্ছিলি, এত তোর বুকের পাটা?

অবশ শরীরে দাঁড়িয়ে কমলাকে দেখছিলাম। হাড়িকাঠের একদিকে তার মাথা। উপুড় হয়ে আছে। কাঠটা গলায় আটকানো। তার সেই বিশাল চুল কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। পরনের শাড়িটা প্রায় খুলে গেছে। পা দুটো একটু একটু নড়ছে। পাশেই পড়ে আছে একটা মাঝারি সাইজের চকচকে খাঁড়া।

হঠাৎ টের পেলাম কমলার হয়তো দম আটকে যাচ্ছে। টানাটানি করে হাড়িকাঠের দুটো কাঠই খুলে ফেললাম। দু'হাতে ওকে ধরে তুলে একটু তফাতে চিত করে শুইয়ে দিলাম। সে গোঙ্গাতে শুরু করল আবার। তখন মন্দিরের বারান্দায় রাখা তান্ত্রিকের কমণ্ডলুটা এনে জল ছেটাতে থাকলাম ওর মুখে।

ওদিকে ভাঁটু যোগীগুণিনের জটা খামচে ধরে প্রচণ্ড চেঁচাচ্ছিল, শম্ভু। মাখনা! ওরে, এদিকে আয় রে! নবা! নবা রে! হরিপদো-ও-ও!

একটু পরে মন্দিরের পেছন দিক থেকে লণ্ঠন আর টর্চ নিয়ে লোকেরা দৌড়ে আসছিল। যোগী তখন বসে পড়েছে। হাউমাউ করে কান্না জুড়েছে। ভাঁটু লাঠির গুঁতো মেরে গজাচ্ছিল, চোওপ। চোওপ। লোকজন দেখে উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল ভাঁটুর। ভয় হল, উল্টে লোকটাকে না খুন করে ফেলে।

ঝাঁপুইতলা এলাকায় এ কিছু নতুন নয়, হংসধ্বজ বলেছিলেন। বছর তিনেক আগে চকচকির বিলের ধারে আবু নামে একটা লোক নিজের বাবাকে বলি দিয়েছিল অমাবস্যার রাতে। এ তল্লাটে মুসলমানরাও গুপ্তবিদ্যা আর তান্ত্রিক

ব্যাপাব বিশ্বাস করে। আর মণি ব্যাটাচ্ছেলে তো খাঁটি তান্ত্রিক বংশ। ওব ঠাকুর্দার বাবাই চন্দ্রকান্তদের জমিদারি কালীপুজোয় নরবলি দিত নিজের হাতে। আমার অবশ্য শোনা কথা। তবে বড় রায়তলায় নরবলি হত প্রাচীনযুগে. তার প্রমাণ আছে। একবাব চন্দ্রকান্তদের ঠাকুরদালানে নতুন ঘর তৈরির জন্য ভিত খুঁড়তে গিয়ে অনেক মাথাব খুলি বেরিয়েছিল।

হংসধ্বজ বলেছিলেন, তোমাকে বলেছিলাম। বড্ড প্রিমিটিভ এলাকা। আমার লড়াই তো এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই। তোমাকে ডাকলাম আমার পাশে দাঁড়াতে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আগের মতো তত জোর নেই শরীরে। তো আমার সন্দেহ তুমি ওদের পাল্লায় পড়ে উল্টে ভূতপ্রেত-তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী হতে চলেছ যেন। তা না হলে তুমি ধনোর সঙ্গে রাতবিরেতে কালীদহে যাবে কেন? তুমি ভেবেছিলে সত্যি পরী দেখতে পাবে। আর থামো, এই ভাঁটু হারামজাদাকে দেখাচ্ছি মজা। মিথ্যা কথা কানের কাছে হাজারবার বললে সত্যি বলে মনে হতেই পারে।

বলেছিলাম. নরবলির ধাক্কায ভাঁটু এখন পুরো বদলে গেছে।

কীরকম, কীরকম?

এখন বলছে, সব গুলতাপ্পি আর বুজরুকি। যোগী তোমাকে মারধর করে ভাঁটু বুঝতে পেরেছে. সেও তার মতো এক মানুষ।

হংসধ্বজ হেসে অস্থির। বলেছিলেন আমি খবর পেয়ে দৌড়ে না গেলে তো ওরা যোগীকে পিটিয়ে মেরে ফেলত। থানাপুলিশ করতে দিলাম না. তার কারণ খামোকা ঝামেলা বাড়ত। কেউ না কেউ মুরুব্বি হয়ে যোগীর পক্ষ নিত। গ্রামে যা হয়। মামলামোকদ্দমার পথে না হাঁটাই ভাল। কেন একথা বলছি, জানো? যোগীর ডিফেন্স হত এরকম, হুজুর ধর্মাবতার। হংসধ্বজ যোগী সেজে বলেছিলেন হাতদুটো জোড় করে। হুজুর ধর্মাবতার। আমার বউ নষ্টা মেয়ে। ঝাঁপুইতলায় কালীপুজো দেখার নাম করে গিয়ে শিবমন্দিরে বদমাইসি করছিল. তাই গিয়ে দুটো ধাক্কাটাক্কা মেরেছি।

আমরা তো সাক্ষী ছিলাম।

হংসধ্বজ সিরিয়াস হয়ে বলেছিলেন, যোগী কী বলেছে জানো তুমি?

না তো। কী বলছে সে?

থাক গে। শুনলে তোমার মন খারাপ হবে।

অবাক হয়ে বলেছিলাম. আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে নাকি?

ছেড়ে দাও।

না, আপনি বলুন জ্যাঠামশাই। (হংসধ্বজকে আমি ওঁর কথামতো জ্যাঠামশাই বলা শুরু করেছিলাম)

হংসধ্বজ দাড়ি খামচে ধরে গুম হয়ে থাকার পর গলার ভেতর বলেছিলেন, ধনোর সঙ্গে তোমার অমন করে যাওয়া উচিত হয়নি। ধনো কাজলি নিয়ে গিয়েছিল তোমাকে। তারপর ধনোকে সাপে কামড়ানোর সময় সেখানে কমলাও ছিল। এই হল ব্যাকগ্রাউণ্ড। না, না—তোমার দোষ নেই। মেয়েটাই ওইরকম। একাদোকা রাতবিরেতে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। চরিত্রও এসব মেয়ের ভাল হয় না। যাই হোক, তারপর কালীপুজোর রাতে শিবমন্দিরেব ওখানে তুমি মেয়েটার শুশ্রূষা করছিলে। একটা ডোমের মেয়ের শুশ্রূষা করছিল একজন বামুনের ছেলে। এটা চোখে পড়েছে কারুর কারুব এবং ভালভাবে নেয়নি। মুকুল, অবাক হয়ো না। গ্রামের মানুষ এরকম।

আবার একটু চুপ করে থাকার পর হংসধ্বজ বলেছিলেন, দুটো ব্যাপাবকে এক করা হয়েছে। তার ফলে অমন সাংঘাতিক একটা খুনখারাপির ঘটনা—যা হতে যাচ্ছিল, ফিকে হয়ে গেছে কারুর কারুর কাছে। এমন কী, নকুল শুনে এসেছে, পুকুরঘাটে মেয়েরা নাকি বলাবলি করছিল, অমন মেয়েকে বলি দেবে না তো পুজো কববে ? বেশ করছিল। তবে তোমাকে বলেছি, এটা লড়াই—ঠিক এভাবে নাও। মিথ্যা কখনও জয়ী হতে পারে না। মুকুল। তুমি মাথা উঁচু করে থাকো। নিজের কাজ কবে যাও।

হংসধ্বজের এসব কথা শোনার পর ঠিক করে ফেলেছিলাম, ঝাঁপুইতলায় আর নয়। প্রকাশ্যে চলে যাওয়ার ঝামেলা আছে। হংসধ্বজ তো কিছুতেই যেতে দেবেন না, কারণ আমি চলে যাওয়া মানে তাঁরই একটা পরাজয় এবং কলঙ্কজনক পরাজয় তো বটেই। তাছাড়া শিক্ষাকেন্দ্রের এই সব বয়স্ক ছাত্ররা আমাকে ভীষণ ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তারাও বাধা দেবে। তাই ঠিক করেছিলাম, রাতারাতি চলে যাব চুপিচুপি।

ম্যাজিকলণ্ঠনের চমকে খুব একটা কাজ হচ্ছিল না। সেন্টারের চত্বরটা প্রথম প্রথম ভরে যাচ্ছিল ভিড়ে। তারপর ভিড় কমতে শুরু করেছিল। লোকে শহরে গিয়ে এবং মেলায়, পালাপার্বণে সিনেমা দেখেছে। তারা সেই ছবি দেখতে চায়। যা কথা বলে, নড়েচড়ে এবং গান গায়। ভাড়া করা রেকর্ড প্লেয়ার বাজিয়ে এবং মাইক লাগিয়ে গানের আয়োজনও করেছিলেন হংসধ্বজ। কিন্তু গান বাজানো বন্ধ হলেই ভিড় কমে যায়। হংসধ্বজ স্লাইড দেখান। আমি স্পিকারে তার ব্যাখ্যা করি। শেষে দেখি, রোজকার ছাত্ররা বাদে বিশেষ কেউ নেই।

হংসধ্বজের মতে, শিশির আর হিমের জন্য লোকেরা থাকছে না। একটা সামিয়ানা খাটালে মন্দ হয় না।

পরদিন সামিয়ানা খাটানো হবে। সে রাতেই আমি ঠিক করলাম চলে যাব। এই জীবনের যে ঝাঁঝালো আদিম চমকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তার খড়মাটির কাঠামোটা বেরিয়ে পড়েছে।

সে-রাতে হেমন্তের ঘ্রাণ জ্যোৎস্নামাখা গ্রামের বুক থেকে ভেসে আসছিল। ক্লাস শেষ হবার পরেও ভাঁটু বসেছিল প্রতি রাতের মতো। বলছিল, ওবারসিয়েরবাবু যাবার নাম করছে না। সপ্তা পেরিয়ে গেল। আপনাকে সেন্টারের মেঝেয় শুতে হচ্ছে। থামুন, কাল আপনাকে একটা তক্তাপোষ বানিয়ে দেব। খুঁটি-টুটি হয়ে যাবে যে-কাঠ আছে : খান কতক তক্তা তো ? হাঁসুবাবুর বাড়ি খুঁজলে তাও মিলবে।

আপন মনে কথা বলছিল সে। কিছুক্ষণ পরে বলল, আজ চিমনির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দুঃখ করছিল খুব।

আনমনে বললাম, কেন ?

ওর বিছানা ফেরত পাঠিয়েছিলেন। সেই কথা তুলে—

চটে গিয়ে বললাম, ওটা ন্যাকামি। ওর বিছানায় শুচ্ছি, এতে ওর কেলেঙ্কারি বাড়ত, জানে না।

আহা, কথাটা তা নয়কো। ভাঁটু আপোসের সুরে বলল। আসল কথাটা শুনবেন, না আগেই রাগ করবেন ? সে কথাটা তো বলতেই দিলেন না আমাকে।

কী ?

ভাঁটু হাসল একটু। দেখা হলেও আর রা কাড়েন না চিমনিকে। সে-রাতে হরিপদর উঠোনে কমলার মাথায় যখন জল ঢালা হচ্ছিল, চিমনি আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল এসে। কথা বলেননি নাকি।

আমি ওকে দেখিনি।

বেশ। তা'পরে কবে বাজারে যাবার পথে দেখা হয়েছিল। পাশ কাটিয়ে চলে এসেছিলেন।

আমি কথা বললে ওর বদনাম হবে। তাই বলিনি।

অতোটা না। ভাঁটু মাথাটা একটু দোলাল। আমার তো মনে হল, চিমনি আপনাকে বাড়ি যেতে বারণ সত্যি সত্যি করেনি। ও কাউকে ডরানোর মেয়ে তো নয়কো। কেউ কি ওকে খেতে পরতে দেয়, না সাহায্য করে যে ও লোককে

ডর করে চলবে ? আপনি ওর কথাটা বুঝতে পারেননি।

থামো। তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না, ভাঁটু।

ভাঁটু খিখি করে চাপা হাসল। আপনি খুব রেগে আছেন ক্যানে গো মাস্টোমশাই ? এই পেথম জানলাম, আপনারও রাগ হয় তাইলে। আমি ভেবেছিলাম এসব জিনিস আপনার মধ্যেতে নেইকো।

আমি রাগ করিনি, ভাঁটু। রাগ করার কী আছে ?

ভাঁটু আস্তে বলল, চিমনি আপনাকে খুব—

সে থামলে চমকানো গলায় বললাম, খুব— তার মানে কী ভাঁটু ?

খুব ভক্তি করে। পেচণ্ড !

চুপ করে থাকলাম। ভাবছিলাম, সত্যিই কি আমি চিমনির প্রেমে পড়েছিলাম— এখনও তাই, কিংবা আমার চুপি চুপি চলে যেতে যে একটু দ্বিধা বার বার খচখচ করে বিঁধছে, তাও কি হংসধ্বজের জন্য নয়, নিছক চিমনির জন্যে ? তবে একথা তো ঠিকই যখনই এই গ্রামের রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ শিউলি ফুলের ঘ্রাণ পাই, তখনই চিমনির কথা আমার বুকে ধাক্কা মারে। বড় ব্যর্থ লাগে নিজেকে।

ভাঁটু গলা ঝেড়ে আস্তে ডাকল, মাস্টোমশাই।

কী ভাঁটু ?

কোথাও একটা রাতপাখি ডাকল। জ্যোৎস্না কমে যাচ্ছে। চাঁদের ফালিটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। এ রাতে সম্ভবত অষ্টমী বা নবমী তিথি। জানালার ফাঁক দিয়ে গাছপালার ওপর নীচে কুয়াশা দেখা যাচ্ছিল ভাঁটু ঘুম ঘুম গলায় বলল, বাগানের ওখানে কাঁড়তে এক কনেস্টোবোল এসেছিল। অশোক বলে ডাকত সবাই। বাবুপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ভাব হয়েছিল। থেটার করেছিল পুজোয়। সরসীবাবুকে দেখে থাকবেন—আমার মতো টাক আছে মাথায়। সরসী ভটচায গো। চেনেন না ?

না। কী ব্যাপার ?

তার একটা মেয়ে ছিল। নাম ছিল শেফালী। তো ভাঁটু খি খি করে হাসল। অশোক কনেস্টোবোলের সঙ্গে শেফালীকে জড়িয়ে গাজনের দিনে ছড়া আর সঙ বেঁধেছিল ছকুবাবু। বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন। হঠাৎ করে মরে গেল। তো অশোক কনেস্টোবোল নাকি জেতে খাটো ছিল। কী জাত, তা বলতে পারব না। বামুন নয়কো, এটুকুন জানি। শেষে শেফালীকে বিয়ে করে—সে এক কাণ্ড। তবে শেষ অব্দি দেখুন, মেনেও নিলে। শেফালীকে নিয়ে বহরমপুর টাউনে

আছে। শেফালীকে দেখলাম কালীপুজোয় বাপের বাড়ি এসেছে। সঙ্গে বর। ধুতিপাঞ্জাবি পরা ফিট বাবু। সিগারেট টেনে বাবুপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খুব ফক্কুরি করছে। আসলে আজকাল আর ততো আঁটাআঁটি নেই ঝাঁপুইতলায়। ক্যানে, মণিঠাকুর যে একসময় লক্ষ্মীকে নিয়ে থাকত—কে করে তার জেতের বিচার? বেশ তো ছিল। পুজোআচ্চাও করে বেড়াত মণিঠাকুর আগের মতো। লক্ষ্মী নিজেই পালিয়ে গেল শেষে। কাজেই এসব কোনো কথাই নয়কো।

তোমার কথাটা কী?

ভাঁটু মুখ তুলে মিটিমিটি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, যদি মেয়েটাকে পছন্দ হয়েই থাকে, আটকায় সাধ্যি কার? উদ্ধারও হয়ে যায় হতভাগী। পাগল বাপ। একলা ওই অবস্থায় থাকে।

বলেই সে তার লম্বা টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে গেল। তার জ্যাবড়া ভারি চপ্পলের থপ থপ শব্দ শুনতে পেলাম কিছুক্ষণ। আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

বেরিয়ে চত্বরে গিয়ে সিগারেট ধরালাম। ঝাঁপুইতলার লোকেদের কাছে বিয়েটিয়ের ব্যাপারটা জীবনের চরম আদর্শ নিশ্চয়। বিয়ে করে ফেলো। তারপর জন্ম দিতে থাকো একগাদা ছেলেপুলের। তারপর কোমর বাঁকা করে নাভিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মরো। পরনের কাপড়! মুখের খাবার। এইটাই এদের জীবন। এমনি করে বেঁচে থাকাটাই সুখের ভাবে এরা। কিংবা এরকম বেঁচে থাকা, মন্থর শ্বাসপ্রশ্বাসক্লিষ্ট জীবন থেকে সুখ খুঁজতে খুঁজতে শেষে মরে যায়।

কথাগুলো অবশ্য হংসধ্বজের। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের স্লাইড দেখিয়ে তিনি এই জীবনযাপনকে তিরস্কার করেন। লোকেরা খুব মাথা নাড়ে। পরে আড়ালে আমাকে বলেন, ঠাকুরমশাইয়ের দাড়িনাড়া থেকে বুড়ির কান্নার গল্পটা জানো তো? ওইরকম একটা ছাগল ছিল বুড়ির। দাড়ি নেড়ে পাতা খেত। মনে পড়ার জন্য বুড়ি কেঁদে আকুল। আমার দাড়ি নাড়াটা হয়তো এদের কাছে সেই রকমই। তবু ওই যে বলেছি, লড়াই।

হ্যাঁ লড়াই। আমারও একটা আলাদা লড়াই আছে হংসধ্বজ জানেন না। ভাঁটুও জানে না। সেটা জীবিকার লড়াই। চিমনি কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকেও যদি বা বিয়ে করার চান্স পাই, পিছিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। ভাঁটুকে একথা বোঝানো অবশ্য বৃথা। এই যে আমি ঝাঁপুইতলায় এসেছি, প্রতিমুহূর্তে একটা অন্য ভাবনা আমাকে কুরে খায়। মা-বোনের চলছে কী করে? টিউশনি করা সামান্য কিছু টাকা রেখে এসেছি। পুরো একমাস হতে এখনও

বাকি আছে কয়েকটা দিন। হংসধ্বজ দেবেন মোটে পঁচাত্তরটা টাকা। ইতিমধ্যে হাত খরচার জন্য আগাম কিছু দিয়েছেনও। অথচ আমি আজ রাতেই ঠিক করে ফেলেছি, চলে যাব চুপি চুপি!

ভাবতে গিয়ে একটু ভড়কে গেলাম। খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হবে। .। মুখ তাকিয়ে বসে আছেন। ফিরতে দেখে ভাববেন—

আমার শরীর শক্ত হয়ে গেল। ভাঁটু ওই কথাটা না বলে গেলে তো এসব ভাবতামই না।

বারোয়ারিতলার দি'ক থেকে হঠাৎ হংসধ্বজের সাড়া এল।.. কে? মুকুল নাকি?

হ্যাঁ। জ্যাঠামশাই! সাড়া দিয়ে সিগারেটটা ঝটপট জুতোর তলায় ঘষে দিলাম।

ভাবছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছ। হংসধ্বজ এগিয়ে এলেন চত্বরে। হাতে টর্চ। হিমে দাঁড়িয়ে কী করছ? ঋতু পরিবর্তনের সময়টা সাবধানে থাকা উচিত। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এস, ভেতরে একটু বসি।

ভেতরে লণ্ঠন জ্বলছিল। মেঝেয় বিছানা পেতে দিয়ে গেছে নকুল। মশারি খাটানো বাকি শুধু। হংসধ্বজ আমার বিছানায় বসলেন। বললেন, বসো। তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

একটু হেসে বললাম, কেমন দেখাচ্ছে? ও কিছু না।

হংসধ্বজ অভ্যাসমতো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, শুয়ে পড়েছিলাম। বনবিহারীর মেয়ের গানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। এখন রাত বারোটা অব্দি চলবে। আর ওই ভোঁদা! তবলা দুটো না ফাঁসিয়ে ছাড়বে না। কী যে করি? কড়াকথা বলতেও বাধে। ওরা বাদে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন বলতে আর কেই বা আছে? এসেছে। হুলুস্থুল করছে। তবু ভালও লাগছে।

বাড়িটা শ্মশান হয়ে থাকে সব সময়।

একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, শুয়ে ঘুম আসার যো নেই। হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। একটা প্ল্যান। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

বেশ তো: বলুন।

প্ল্যানটা বেশ লম্বাচওড়া। হংসধ্বজ দেয়ালে হেলান দিয়ে বালিশটা কোলে তুলে নিলেন। সামনের সপ্তাহ নাগাদ কাতকে ধান অর্থাৎ কার্তিক মাসে যে ধান ওঠে, উঠতে শুরু হবে। ইনভেরিয়েবলি ছাত্র কমে যাবে। অঘ্রাণ-পউষে তো

দু-চারজন বাদে পাবেই না কাউকে। সে-ওদের দোষ নেই। কাজের সময় ওই তিনটে মাস। গ্রীষ্মে আর শরতকালটাতে অবসর পায়। কাজকর্মও জোটে না, তাই। আমি ভাবছিলাম, একটা ব্যবস্থা করলে কেমন হয় ? তুমি তো সব সময় অ্যাভেলেবেল। এই ব্যবস্থা যদি করি, যে যখন অবসর পাবে, এসে পড়ে যাবে। একজন আসুক, দুজন আসুক—তুমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে বসবে। কী ?

বেশ তো।

এবার নেক্সট আইটেম। খবরের কাগজ পড়ে বুঝিয়ে দেওয়া। আমি তো একটা কাগজ রাখি। অসুবিধে নেই ! একজন হোক, দুজন হোক, কিছুক্ষণ পড়ার পর কাগজ নিয়ে—কেমন ?

মাথা দোলালাম।

ইতিমধ্যে আর একটা কাজ তুমি করো। কালই গোপগাঁ ব্লক অফিসে চলে যাও আমার চিঠি নিয়ে। বিডিওকে দেবে। অ্যাডাল্ট এড়ুকেশনের ওপর নাকি ভাল সিনেমা আছে, বিডিও বলছিলেন। উনি সে ব্যবস্থা করে দেবেন। মানে অন্তত একটা দিন যদি দেখানো যায়, লোকের উৎসাহ বাড়বে।

একটু চুপ করে থেকে বললাম ফের, আর একটা কথা ভেবেছি অনেকদিন ধরে। ফিমেল এডুকেশন—মানে অ্যাডাল্ট ফিমেল এড়ুকেশান। বনবিহারী কথায়-কথায় বলল, ঝিমি গ্রাজুয়েট হয়েছে। চাকরির চেষ্টা করছে-টরছে। বিয়েরও উপযুক্ত হয়েছে অবশ্য। তো আমি ভাবছিলাম, ঝিমিকে রেখে দিই। ওকে তো মাইনে দিতে হবে না। যথাসময়ে ওর বিয়ের ব্যবস্থা না হয় আমিই করব—আমার সেটা কর্তব্যও বটে। কী বলো ?

সায় দিলাম, বেশ তো।

হংসধ্বজ চাপা গলায় বললেন, ঝিমির বড় আর দুটো মেয়ে আছে বনবিহারীর। তাদের বিয়ে দিতে ওর বারোটা বেজে গেছে। এখানে ওর আসার আসল উদ্দেশ্যই হল, ঝিমির দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপানো। বলে কী, হাঁসুদা, আপনি তো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক। দিল্লি অব্দি আপনার জানাশোনা। ঝিমির একটা ব্যবস্থা—খিক খিক করে হাসতে লাগলেন হংসধ্বজ। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, আপাতত এই। এবার তোমার মতামত ফ্র্যাংকলি বলো, শুনি।

শুধু বললাম, আমার তো ভালই লাগছে আপনার প্ল্যান। মেয়েরাও লেখাপড়া শিখুক।

হংসধ্বজ দাড়ি চুলকে বললেন, বিডিও'র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। একদিন ওদের সোশ্যাল এডুকেশন অফিসারকে পাঠাবে আমাদের সেন্টারে। অ্যাদ্দিন সরকারি

শনির ছায়া বাঁচিয়ে চলেছি। কিন্তু বিডিও অতিশয় ভদ্রলোক। অ্যাডাল্ট এডুকেশনেব সরকারি স্কিমের কথা যা সব শুনলাম, তাতে ঝামেলা আছে বলে মনে হল না। ওদের কারিকুলামও সায়েন্টিফিক। ব্যক্তিগত উদ্যোগকেও ওঁরা সাহায্য করেন বললেন। জিনিসপত্র, বইখাতা, শ্লেট-পেন্সিল, তোমার গিয়ে বোর্ড—যা যা লাগে, সব দিয়ে থাকেন। কেরোসিনের ব্যবস্থা পর্যন্ত! আমার তো এতটা জানা ছিল না। তুমি কাল চলে যাও গোপগাঁ। বাসে আধঘন্টার পথ। নটা নাগাদ বেরিয়ে পড়বে। কেমন?

তারপর হঠাৎ উঠে পড়লেন হংসধ্বজ। না। রাত হয়েছে। তুমি ঘুমোও। বলে হন হন করে চলে গেলেন।

দবজা এঁটে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লাম। তাহলে বরং আরও দুটো দিন থাকা যাক। মাইনের টাকাটা আদায় করে নিয়েই চলে যাব। অত ঝক্কি পোষাবে না। তাছাড়া একটা অস্বস্তি নিয়ে বিদেশে বিভুঁইয়ে থাকা যায় না। যোগী গুণিন অসতী বউকে বলি দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার রাগটা আমার ওপরই বেশি মনে হচ্ছে। তা না হলে আমার নামে কেলেঙ্কারি রটাত না। এসব লোককে বিশ্বাস করা যায় না। কখন এসে রাতবিরেতে খুন করে চলে যাবে।

কথাটা ভাবতেই এমন আতঙ্ক হল যে তক্ষুনি মশারি থেকে বেবিয়ে চত্বরের দিকের দুটো জানালাই বন্ধ করে দিলাম। উল্টো দিকের জানালা দুটোর মাঝখানে আমার বিছানা। ওদিকে একটা গভীর ডোবা। দেয়ালের পাশে ঘন আগাছার ঝাড়। ওদিকের কোনো জানালা দিয়ে যোগী তার ত্রিশূলটা বাইরে থেকে ছুঁড়ে মারতে পারে কি না দেখে নিলাম। দেয়াল ঘেঁষে শুলে বেঁচে যাওয়ার চান্স পুরোপুরি।

ঘুম আসছিল না। ভাঁটু বা কাউকে থাকতে বললে ভাল হত। বরং কাল তাই করতে হবে। যতবার চোখ টেনে ধরে, মনে হয় আততায়ী এসে দাঁড়িয়েছে দেয়ালের ওধারে। কান খাড়া করে থাকি। একটু শব্দে চমকে উঠি। রাতটা বুকে চেপে বসেছিল প্রচণ্ড ভারি হয়ে।

তারপর একসময় দরজায় ধাক্কার শব্দে একলাফে উঠে বসলাম। ওই এসে গেছে যোগী ডোম দলবল নিয়ে। তার হাতে নিশ্চয় সেই ত্রিশূলটাও আছে। মরিয়া হয়ে গেলাম হঠাৎ।

কিন্তু তখনই ষড়যন্ত্রসংকুল স্বরে বসোবাবুর ডাক শোনা গেল, বসন্তো! ও বসন্তো! বসন্তো!

শুয়ে পড়লাম। রাতদুপুরে পাগলের সঙ্গে কথা বলার মানে হয় না। কিন্তু

বসোরাবু ক্রমাগত দরজা থেকে জানালা, জানালা থেকে দরজার ওপর মুখ রেখে 'বসন্ত, বসন্ত' বলে ফিসফিস করে ডাকতে থাকলেন। যেন 'বসন্তের' জন্য কোনো গোপন খবর এনেছেন 'পাঁচুগোপাল'।

কিছুক্ষণ পরে রেগে গেলেন যথারীতি। জোরে লাথি মারতে শুরু করলেন কপাটে। ভাঁটু মিস্ত্রি যত্ন করে কপাটজোড়া তৈরি করেছে। পায়ে নিশ্চয় ব্যথা ধরে গেল বসোবাবুর। গাল দিতে দিতে ঢিল ছুঁড়তে থাকলেন। খট খট করে ঢিলগুলো এসে বন্ধ দরজার কপাটে লেগে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল।

এতক্ষণে চত্বরের ওপাশের বাড়িটা থেকে ভানু ধরের গলা শোনা গেল। দেখছ? দেখছ পাগলাবাবুর কাণ্ড রাতদুপুরে? মাস্টারমশাইকে জ্বালাতে এসেছে। তবে রে পাগল! থাম, যাচ্ছি।

ধুপধুপ শব্দ শুনতে পেলাম। ভানু ধর বেরিয়ে এসে চেঁচাচ্ছিল, ধর! ধর পাগলাবাবুকে! ধরে ওর চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দে!

ভানু ধর হাসছিল। একটু পরে সে আমাকে ডাকল, মাস্টারমশাই! জেগে আছেন?

সাড়া দিলাম। ভানু নাকি?

হ্যাঁ। বসোবাবুর কাণ্ড। ঘুমোন! আর আসবে না। চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেবার কথা বললে আর ত্রিসীমানায় থাকবে না দেখবেন।

ভানু ধরের বাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম। ওর কথা ভেবেই এতক্ষণে নিশ্চিন্তে ঘুমোনোর জন্য পাশ ফিরে শুলাম। তবু ঘুম আসছিল না। বারবার ভাঁটুর সেই কথাটা মনে পড়ছিল আর বারবার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল চিমনি—কিংবা চিমনি নয়, কুন্তলা।

সে রাতে স্বপ্নেও চিমনি এল। কাশবনের ভেতর একটা সাপ হয়ে ফণা তুলে। ধনো বলল, সাব্বোধান, সাব্বোধান! তারপর চিমনি মানুষ হয়ে গেল। বললাম, কুন্তলা, শোনো! একটা ট্রেন আসছিল। আশ্চর্য এক সবুজ ট্রেন ছুটন্ত কাশবনের ভেতর দিয়ে। চিমনিকে তুলে নিয়ে চলে গেল। আমি দুঃখে অস্থির।

মাইল সাতেক দূরে বনেদি গ্রাম গোপগাঁ প্রায় শহর হয়ে উঠেছে। মাঝখান দিয়ে হাইওয়ে চলে গেছে কলকাতার দিকে। ব্লক ডেভালাপমেন্ট অফিসার বারবার 'টাউনশিপ' শব্দটা ব্যবহার করছিলেন। হাইওয়ের ধারে গম্ভীর নয়ানজুলির ওপর পোক্ত কাঠের সাঁকো পেরিয়ে ব্লক অফিস আর কোয়ার্টার। ইউক্যালিপ্টাস, কৃষ্ণচূড়া, ঝাউ, পরেবিথরে একটা মুক্তগাছ। তার ভেতর হলুদ

রঙের সব ছবির মতো বাড়ি। মসৃণ, সুখী চেহারা। চলে আসার সময় সেই সুখী বাড়িগুলোর কোনো একটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অসুখী চেহারার এক যুবক। পাতাচাপা ঘাসের মতো গায়ের রঙ। এই বয়সেই টাকের লক্ষণ তার মাথায়। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললাম, রমেন! তুই এখানে?

রমেন আমাকে দেখে মোটেও চমকাল না। ওর বরাবর এই স্বভাব। তা বাঁকা মুখ করে বলল, আর বলিস কেন? কী বিচ্ছিরি একটা চাকরি জুটিয়েছি, ভাবতে পারবি না। তুই বুঝি এখানে থাকিস?

না রে। ঝাঁপুইতলায়।

রমেন একটু হাসল। কী নাম! সে আবার কোথায়!

রমেন কাটোয়া কলেজে আমার সঙ্গে পড়ত। ওর দাদা ছিলেন সাবরেজিস্ট্রার। পরে কোথায় বদলি হয়ে যান। রমেনও তারপর চলে গিয়েছিল। প্রায় তিন বছর পরে দেখা। কিন্তু দেখলাম তার মাথায় টাকের লক্ষণ ছাড়া সবই আগের মতো রয়ে গেছে। সেই অসুখী চেহারা। বাঁকা-বাঁকা কথাবার্তা। সব তাতেই ছিঘেন্না আর অসন্তোষ। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট কিনল। সিগারেটের ওপরও তেঁতো মন্তব্য করল। বলল, এখানকার চায়ে মুখ দেওয়া যায় না। তবু খা! কদ্দিন পরে দেখা হল। তা তুই পুঁইতলা না কোথায় কী করছিস?

বলতে যাচ্ছি, বলতে দিল না। হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তো ওই পুঁইতলায় তালের গাছ-টাছ আছে?

অবাক হয়ে বললাম, অসংখ্য। কেন?

বলিস কী! রমেন লাফিয়ে উঠল। তাহলে ওখানেই পোস্টিং চেয়ে নিই। তুই আছিস যখন, তখন কষ্ট করেও থাকা যাবে। আমি গতকাল সবে জয়েন করেছি। কোথায় পোস্টিং হবে এরা খুঁজেই পাচ্ছে না। গর্ভমেন্টের মাইরি কী উদ্ভুটে কারবার! তালগুড়।

তালগুড় মানে?

রমেন তেতো-গেলার ভঙ্গী করে বলল, ছমাস ট্রেনিং নিতে হয়েছে কেমন করে তালগাছের রস থেকে গুড় তৈরি করতে হয়। এসব অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস খুঁজেও বের করে কারা। আমাকে এখন তালগাছওলা গ্রামে গিয়ে লোককে অর্গানাইজ করে তালগুড় সমিতি করতে হবে। শেখাতে হবে সায়েনটিফিক প্রসেসে—সায়েনটিফিক! শালা সায়েন্স জিনিসটারই অপমান। কোথায় আইনস্টাইন জগদীশ বোস, কোথায় তালগুড়?

রমেন সায়েন্স বলতে অন্যরকম বোঝে। হাসি পাচ্ছিল ওর কথা শুনে। তবু ওর পোস্টটার নাম বেশ গালভরা : ইন্সপেক্টর। রমেন বলল, ইন্সপেক্টর! ভাবতে পারিস? মাইনে শুনলে হেসে মরে যাবি। তাও গ্র্যান্টের টাকায়। যাকগে, মরুকগে! তোকে দেখে বুকটা ফুলে উঠল, মুকু! আজই তোর ঝাঁপুইতলায় পোস্টিং ম্যানেজ করে ফেলছি।

দিন চারেকের মধ্যেই ব্লক থেকে অডিওভিসুয়াল ইউনিট আসবে ঝাঁপুইতলায় সিনেমা দেখাতে। হংসধ্বজ খবর রটিয়ে দিতে দেরি করলেন না। তালগুড়ের ব্যাপারটা শুনে উনি লাফিয়ে উঠলেন, খুব ভাল খুবই ভাল। এটা আমিও ভেবেছিলাম। প্রচুর তালগাছ ঝাঁপুইতলায়। খালি তাড়ি বানিয়ে আর কাঁচা বা পাকা তাল খেয়ে গাছগুলোকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। অথচ কী এলাহি ইন্ড্রাস্ট্রির সম্ভাবনা আছে ভেবে দ্যাখো! শুধু তালগুড় নয়, তালমিছিরি! প্যাকেটে করে বিদেশে এক্সপোর্ট হবে। গ্রামবাসীর হাতে টাকা আসবে। হ্যাঁ, তোমার বন্ধুর কোনো অসুবিধে হবে না। তাকে ওয়েলকাম করছি। আসুক। আমি তাকে হেল্প করব।

রমেন পর দিন বিকেলে রিকশায় বেডিং-বাকসো নিয়ে সোজা সেন্টারে এসে হাজির হল। আমার থাকার ব্যবস্থা দেখে নাক কুঁচকে বলল, মেঝেয় পড়ে থাকিস তুই? সে কী রে!

খবর পেয়ে হংসধ্বজ এলেন হন্তদন্ত হয়ে। এসেই আবেগজড়িত গলায় বললেন, স্বাগত! সুস্বাগত!

রমেন হংসধ্বজের পায়ে টিপ করে প্রণাম করে বলল, আপনার কথা বিডিও বলছিলেন। মুকুলও বলেছে। আপনাকে আমি কিন্তু দাদামশাই বলব। কেন জানেন? আমার দাদামশাইয়ের মুখে অবিকল এমনি দাড়ি ছিল!

হংসধ্বজ খুব হাসলেন একথা শুনে। শেষে বললেন, আপনার বন্ধু আমাকে জ্যাঠামশাই বলে।

অমনি রমেন বলে উঠল, ওক্কে! তাহলে আমিও বরং জ্যাঠামশাই বলব। আপনি আমাকে তুমি বলবেন।

হংসধ্বজ বললেন, বেশ তো! খুব ভাল, খুব ভাল!

কিন্তু জ্যাঠামশাই, আমি থাকব কোথা? আপনার ভরসায় এসেছি—মাইন্ড দ্যাট্!

অসুবিধে কিসের? এত বড় ঘরে দুজনের যথেষ্ট জায়গা হবে আপাতত। হংসধ্বজ একটু ভেবে নিয়ে বললেন। তবে এখানে সব পড়তে আসে। ক্লাসরুম

হিসেবেই করা হয়েছে। দুটো দিন কষ্ট করে থাকো। দেখি, কোথাও তোমার জন্য একটা খালি ঘর-টর পাওয়া যায় নাকি। গ্রামে তো ঘরভাড়া পাওয়া যায় না। সেটাই সমস্যা। খালি ঘর ভাড়া দেওয়াটা লোকে অসম্মানজনক মনে করে।

রমেন বলল, টাকা পেলেও ?

টাকা পেলেও। হংসধ্বজ একটু হাসলেন। আমাদের গ্রামের মানুষদের ধ্যানধারণাটা একটু অন্যরকম। যাই হোক, ভেবো না। হাইওয়ের ধারে বাজার এলাকাতে একটা ঘর মিলতেও পারে। দেখছি।

রমেন ঘরের ভেতরটা দেখে স্বভাবমতো নাকের ডগা-কুঁচকে বলল, মেঝেয় শোওয়ার অভ্যেস নেই—সেই হয়েছে প্রবলেম। অন্তত একটা তক্তাপোষ-টোস…

হংসধ্বজ হাসতে হাসতে বললেন, গ্রামে এসেছ বাবা ! একটু কষ্ট করতেই হবে। এই জীবনের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে না চললে তো গ্রামে থাকতেই পারবে না। এটা একটা লড়াই বলে ধরে নাও।

উরে বাস ! বলেন কী ! লড়াই ! লড়াই লড়াই লড়াই চাই ! রমেনের অসুখী মুখে নিছক তামাশা, না ব্যঙ্গ ফুটে বেরুচ্ছিল, বুঝলাম না। রমেন হাত দুটো মুঠো করে স্লোগানের ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল।

হংসধ্বজ গম্ভীর মুখে আস্তে আস্তে চলে গেলেন। রমেন চাপা গলায় বলল, বুড়ো খচে গেল নাকি রে ? আচার্য পি সি রায়ের ছবি দেখেছি। হুবহু সেইরকম মাইরি। তাই না ?

বললাম, রমেন ! এই ভদ্রলোকের সম্পর্কে একটু শ্রদ্ধা রাখিস ! এঁর লাইফ হিসট্রি শুনলে…

রমেন কথা কেড়ে বলল, মুকু ! তোর বারোটা বেজে গেছে। শ্রদ্ধা-টদ্ধা এসব শব্দ শুনলেই মাইরি গা ছমছম করে। তুই এসব পেলি কোথা রে ? এই পুঁইতলায় প্রচুর পড়ে আছে নাকি !

চেয়ার নেই, শুধু টুল দেখে রমেনের নাকের ডগা আরও কুঁচকে গেল। বাইরের চত্বরে টুলটা বের করে সে বসল। আমাকে খুব বকাবকি করতে থাকল। চেয়ার-টেয়ার বা তক্তাপোষ ম্যানেজ করতে পারিনি বলে আমার মুখচোরা স্বভাবকে একচোট নিল। সেই সময় চা আর নিমকি নিয়ে এল নকুল। রমেনকে সে নমস্কার করে বলল, বাবুমশাই আপনার জন্য ঘর খুঁজতে বেরুলেন। হরেনবাবুর নাকি নতুন ঘর আছে একখানা—বাজারের উঁদিকে।

পেয়ে গেলে ভাল। তবে পাশের ঘরে আবার ধানভানা কল। রেতের বেলা বন্ধ থাকে অবিশ্যি। দিনে বেজায় শব্দ!

রমেন বলল, শুনছিস? পুঁইতলা কেন যে চলে এলাম! শুধু তোর জন্য।

নিমকিগুলো গরম ছিল। নকুলকে বললাম, কোথায় পেলে নকুল? বাজার থেকে আনলে নাকি?

নকুল চোখে ঝিলিক তুলে বলল, আজ্ঞে না। ঝিমনিদিদি ভাজল।

চিমনি? অবাক হয়ে বললাম।

না, না। ঝিমনি। বলে সে জিভ কাটল। আমার খালি গণ্ডগোল হয়ে যায়। ওবারসিয়েবাবুর মেয়ে গো—হুঁ, ঝিমিদিদি।

বনবিহারীবাবু আজ সকালে চলে গেছেন ঝিমিকে রেখে। সে নিমকি ভাজতে পারে জেনে অবাক লাগল। বললাম, তোমার ঝিমিদিদি তাহলে রান্নাবান্নাও জানে?

নকুল বলল, জানে না তো দুপুরে খেলেন কার রান্না? তফাত বুঝতে পারেননি?

আজ দুপুরে অবশ্য হংসধ্বজের বাড়িতে গিয়ে খেয়ে এসেছি অনেকদিন পরে। কিন্তু ঝিমিকে দেখতে পাইনি। নকুলই পরিবেশন করেছিল। হংসধ্বজ বাড়িতে ছিলেন না। ঝিমি কোথায় ছিল কে জানে!

নকুল চলে গেলে রমেন বলল, ঝিমিদিদিটা কে রে? আচার্যদেবের কন্যা বুঝি?

না। ওঁর মামাতো ভাই থাকেন সিউড়িতে। তাঁর মেয়ে।

দেখতে-টেখতে কেমন?

মন্দ না।

তুই নিশ্চয় টিপে দেখেছিস—রেসপন্স কেমন?

ভাঁটু আসছিল দেখে চোখ টিপে বললাম, চুপ। ভাঁটু এসে নমস্কার করে একগাল হেসে রমেনকে বলল, শুনলাম তালগুড়বাবু এসেছেন কে। তাহলে আপনি? খুব ভাল কথা।

রমেনের নাকের ডগা আবার কুঁচকে গেল। বললাম, ভাঁটু, উনি ইন্সপেক্টরবাবু।

নেসপেক্টরবাবু? ভাঁটু জিভ কেটে বলল। দ্যাখো দিকিনি, আমি শুনলুম তালগুড়বাবু এসেছেন। তালের তাড়ি ধরতে আসেন না আবগারিবাবুরা? তাঁদেরই কেউ হবেন। ভাঁটু খি খি করে হাসল। কুনাইপাড়া বাউরিপাড়া

একেবারে তটস্থ খবর শুনে। হরিপদ বলে কী, এখন তো তাড়ি হয় না গাছে। ধরবে নবডঙ্কাটি! টেসরিলিফের গম দিয়ে পচুই করে খাচ্ছি। খাবো না না হয় কিছুদিন। বাজারে সাহুমশাইয়ের ভাটিখানায় যেয়ে বসলে তো আর ধরতে পারবে না। ভাঁটু খুব হাসতে লাগল।

রমেন শ্বাস ফেলে বলল, আমি গেছি। অথৈ সমুদ্রে।

ভাঁটু অবাক হয়ে বলল, ক্যানে নেসপেট্টরবাবু?

ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে বললাম ওকে। শুনে ভাঁটু গুম হয়ে বলল, তাড়ি ফেলে কি গুড় করতে চাইবে কেউ? তাড়ি হল গে ওদের মুখের আহার। বোশেখ থেকে চারটে মাস মচ্ছব করে খায়। ভাতে তাড়ি, মুড়িতে তাড়ি। আবার তাড়িটুকুন পেটে পড়লে মাঠে খাটতে দুনো বল পায় শরীরে। তবে বাবুদের বিস্তর গাছ আছে। তেনারা খুশিই হবেন বরঞ্চ। কিন্তু তাইলে পরে ভেবে দেখুন, গরিবগুরবো ছোটলোক-টোটলোক মনিষ্যির মুখের গেরাস কাড়া হল কি না? বর্ষার সময়টা পাকা তাল কুড়িয়ে বেড়ায় রাতবিরেতে বিষ্টিবাদলায়। ক্যানে—কী, পেটের আহার। তালের গুড় করবে বাবুরা। মোচা ছেঁটে রস হবে। তাইলে আর পাকা তালের আশাও ব্রেথা।

হতাশভাবে মাথাটা নাড়ল সে। রমেনকে বললাম, শুনছিস?

রমেন মুখ বাঁকা করে বলল, কারা এসব স্কিম করে মাইরি? যাক গে বাবা। আমার চাকরি করা নিয়ে কথা! রোজ মিটিং করব। ভাষণ দেব। রিপোর্ট পাঠাব। ব্যস!

ভাঁটু আমার দিকে চোরা চাউনি ফেলে বলল, একটা কথা ছিল মাস্টোমশাই।

বলো।

একটু গা তুলুন দয়া করে।

তফাতে নিয়ে গিয়ে ভাঁটু চাপা স্বরে বলল, খানিক আগে আমার বাড়ি এসেছিল চিমনি। এই পত্তরখানা লুকিয়ে আপনাকে দিতে দিয়ে গেল। এই নিন।

সে ফতুয়ার পকেট থেকে ভাঁজকরা চিঠিটা বের করে আমাকে দিল। তারপর একটু হাসল। খুব দুঃখ পেয়েছে মেয়েটা। আপনাকে বড়ই ভক্তি করে কি না।

দিনশেষের ধূসর আলোয় কাগজটা মেলে ধরলাম। 'শ্রদ্ধেয় মুকুলদা, আমি জানি আপনাকে ভীষণ অপমান করেছিলাম সে রাতে। অথচ আপনি তো কোনো অন্যায় করেননি। আপনি আমার কাছেও আসেননি। এসেছিলেন বাবাকে পৌঁছে দিতে। কিন্তু কেন হঠাৎ আমি আপনাকে অপমান করে

বসলাম ? আমার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল। আপনি চলে গেলেন। তারপর চমকে উঠলাম। কেন ওকথা বললাম ? ভাববেন এ আমার ন্যাকামি। বিশ্বাস করুন, সে রাতে আমি নিজের ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে উঠেছিলাম। আমার হতভাগ্য জন্মদাতার গায়ে আঘাত করে এসে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল অনুতাপে। আর সেই সময় আপনি এলেন। আপনি চোখের সামনে দেখেছেন আমার ওই নিষ্ঠুর কীর্তিকলাপ। আপনি আমার পাপের সাক্ষী। অপমানে আমি আপনাকে সহ্য করতে পারিনি। হয়তো সেজন্যই অমন আঘাত করে বসেছিলাম। বলবেন, বাবাকে মারধার তো অন্যলোকের সামনেও করেছি। তা ঠিক। কিন্তু মুকুলদা, আপনি যে বাইরের মানুষ। আমার চোখে আপনি এমন মানুষ, যার কাছ থেকে নিজের দীনতা লুকিয়ে রাখতে হয়। আমি এই গ্রামেরই মেয়ে আসলে। এখানকার লোকের কাছে আমার কোনো দীনতার জন্য লজ্জা করার নেই। লুকোবারও কিছু নেই। এদের আমি চিনি বলেও তুচ্ছ জ্ঞান করি। কিন্তু আপনি একজন অচেনা মানুষ। অত্যন্ত সরল, ভদ্র, সহানুভূতিশীল, আদর্শবাদী মানুষ। তা না হলে হাঁসুজ্যাঠার ওই পাগলামির সঙ্গে নিজের জীবনটা জড়াতে আসতেন না। আমি বিশ্বাস কবতে পারি না, নিছক চাকরির জন্য আপনি এখানে পড়ে আছেন। সেইসব কথা ভেবে আমার এত খারাপ লেগেছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন না মুকুলদা ! আমি জানি. অপমানটা আপনাকে খুবই বেজেছে। তাই দেখা হলেও কথা বলেন না। মুখ নামিয়ে চলে যান। আমার কষ্ট হয়। রোজই ভাবি, আপনাকে একটা চিঠি লিখে ক্ষমা চাইব। লজ্জা-দ্বিধা-সংকোচ আমাকে চেপে ধরে। আজ সব ভেঙ্গে ফেলে লিখতে বসলাম। ভাঁটুকাকার হাত দিয়ে আপনার কাছে পাঠাব। কারণ এই লোকটিকে আমি বিশ্বাস করি। তাছাড়া সে আপনাকেও খুব শ্রদ্ধা করে। যদি সে এ থেকে কোনো ভিন্ন ধারণা করেও বসে, কিছু যায় আসে না। আমি তো জানি, সেটা সত্যি নয়। আপনিও নিশ্চয় জানেন, তা সত্যি নয়। তাই মরিয়া হয়ে এই চিঠি। প্রণাম নেবেন। ইতি, ক্ষমাপ্রার্থিনী কুন্তলা।'...

ভাঁটুর মুখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছিল। তার সঙ্গে উত্তেজনাও। শ্বাস বন্ধ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকালে সে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আপনাকে বলেছিলাম !

আস্তে বললাম, ঠিক আছে। ওকে বলবে, ও ভুল বুঝেছে। আমি একটুও রাগ করিনি।

ভাঁটু হাঁসফাঁস করে বলল, না, না। এক কলম লিখেই দিন বরঞ্চ। নৈলে

ভাববে, আপনাকে দিইনি। মেয়েছেলে বলে কথা। বুঝলেন না?
ওর ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে একটু হেসে বললাম, ঠিক আছে। রাত্রে লিখে দেব। নিয়ে যেও।
এ রাতে হয়তো এক 'নেসপট্টরবাবু'কে তালগুড়ের সঙ্গে যাঁর রহস্যময় সম্পর্ক আছে, দেখার জন্যই পড়ুয়াদের দলে নবাগতদেরও দেখা যাচ্ছিল। একবার মুখ দেখালেই খাতায় নাম ওঠানোর নিয়ম নেই। অন্তত তিনদফা 'ক্লাসে' নতুন মুখ দেখতে পেলে নিয়ম হল তাকে জেরা করার। জেরার দায়িত্ব সর্দারপোড়ো ভাঁটু মিস্ত্রির। সে দেবদেবী-পীরপয়গম্বরের নামে দিব্যি কাটিয়ে তবে আমার দিকে ঘুরে বলবে, নাম লেখুন মাস্টোমশাই।
এ রাতের নবাগতরা শুধু নয়, নিয়মিত পড়ুয়াদের অনেকেও যেন রমেনকেই আমার চেয়ে সরেস ঠাওরাচ্ছিল। রমেন এই সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। তালগুড়ের ব্যাপারটা নিয়ে একটা ভাষণ দিয়ে তবে ছাড়ল। আমাকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণাও করল, ব্লকের 'গ্রামসেবক'বাবুও এবার তার সঙ্গে কাজে নামবেন।
গ্রামসেবক ভদ্রলোককে আমি দূর থেকে দেখেছি। এই অ্যাডাল্ট এডুকেশান সেন্টার নিয়ে নাকি তাঁর সঙ্গে হংসধ্বজের কী একটা মতান্তর ঘটেছিল। হংসধ্বজ তাঁকে নাকি বলেছিলেন, আমার সেন্টারের ত্রিসীমানায় ঘেঁষলে ভাল হবে না। ভাঁটুর কাছে শোনা। তাই রমেনের কথা শুনে আমি প্রমাদ গুণলাম। হংসধ্বজের কোনো সহযোগিতা তাহলে তো সে পাবে না। সে-রাতে যতক্ষণ ক্লাস হল রমেন, বেরিয়ে কোথায় গেল কে জানে। ক্লাস শেষ হলে নকুল চা আনতে গেল প্রথা অনুসারে। তারপর চা নিয়ে এসে বলল, মাস্টোমশাই খেতে যান। বাবুমশাই ডাকছেন।
বললাম, ইন্সপেক্টরবাবুকে দেখেছ, নকুল? সে না এলে তো—
নকুল কথা কেড়ে বলল, উনি তো বাবুমশাইয়ের কাছে আছেন। গানের আসর বসেছে। আপনি আসুন।
বারোয়ারিতলায় যেতেই কানে এল হংসধ্বজের বাড়িতে গানের আসর বসেছে। হারমোনিয়াম এবং তবলা বাজছে। গান গাইছে নিশ্চয় ঝিমি।
গিয়ে দেখি, হংসধ্বজের ঘরের মেঝেয় হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে ঝিমি এবং তবলা বাজাচ্ছে স্বয়ং রমেন। রমেন তবলা বাজাতে পারে কল্পনাও করিনি।
হংসধ্বজ তাঁর বিছানায় ঋষির মতো যোগাসনে বসে চোখ বুজে আছেন।

আমি ঢুকলে টের পেয়ে চোখ খুলে মুচকি হেসে পাশে বসতে ইশারা করলেন।

ঝিমি ভালই গায়। মাঝে মাঝে সে রমেনের দিকে তাকিয়ে কেমন হাসছিল। হয়তো তালটা মিলছে, তারই সায়। অথবা মিলছিল না। গান শেষ করে ঝিমি হারমোনিয়াম একটু ঠেলে দিয়ে রমেনকে বলল, এবার আপনি।

রমেন তবলায় দ্রুততালে বোল ফুটিয়ে বলল, মুকু! কাম অন!

ঝিমি চোখ বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মুকুলবাবু, গান গাইতে পারেন বলেননি তো! তার সঙ্গে হংসধ্বজও গলা মেলালেন, সে কী! মুকুল তাহলে আত্মগোপন করে আছে এতদিন! কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! তাহলে তো—

বুঝলাম তাহলে কী করতেন। বয়স্ক শিক্ষার গান রচনা করে আমাকে গাইয়ে ছাড়তেন এবং নির্ঘাত আমাকে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে সারা গ্রাম ঘুরতে হত বয়স্কশিক্ষার প্রচারে। জোরে মাথা নেড়ে বললাম, আমি গান গাইতে পারি না। রমেন ঠাট্টা করছে।

রমেন তবলায় বোল তুলতে তুলতে বলল, যা পারিস। চলে আয়!

যদি গাইতে পারতামও, এরাতে গাইবার মেজাজ থাকত না। চিমনির চিঠিটা আমার শার্টের বুকপকেটে উত্তাপ দিচ্ছিল সারাক্ষণ। কখন তাকে জবাব লিখতে বসব, ভাঁটু আমার অপেক্ষায় বসে আছে এখনও, শুধু সেই চিন্তা। ঝিমির কিছু পীড়াপীড়ির পর হংসধ্বজ দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, থাক, থাক। ওকে আর টানাটানি করিসনে. ঝিমু! খাওয়ার ব্যবস্থা কর। ও নকুল।

ভেতরের বারান্দা থেকে নকুল বলল, আসন করেছি বাবুমশাই! বাবুদিদি, আসুন এবারে।

খেতে বসে রমেন বলল, শ্রীমতী ঝিমিও খাবেন আমাদের সঙ্গে। নকুল পরিবেশন করুক।

হংসধ্বজ বললেন, বস্ ঝিমু। আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নে।

আমি, তারপর রমেন, তারপর হংসধ্বজ বসতে যাচ্ছিলেন। ঝিমি সেখানে আগেই বসে পড়ল। হংসধ্বজ হাসতে হাসতে পরের আসনে বসলেন।

রমেনের তবলা বাজানোর ক্ষমতার মতো মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাবার ক্ষমতাও যেন অসামান্য। খেতে খেতে হংসধ্বজ তালগুড় নিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করলেন রমেনের সঙ্গে। রমেন ঝিমির সঙ্গে সঙ্গীত আলোচনায় মশগুল। তখন হংসধ্বজ আমার সঙ্গে শুরু করলেন।

আড়চোখে লক্ষ্য করছিলাম রমেন নকুলকে ডেকে এটা-ওটা ঝিমির পাতে

দিতে বলছে। আর নকুল সেটা সামনে আনলে ঝিমি তা জোর করে রমেনের পাতে দিতে বাধ্য করছে। ভাবলাম, যা বাবা! সঙ্গে সঙ্গে প্রেম শুরু হয়ে গেল। রমেনটা পারে বটে। আর ঝিমিও যেন প্রেমের জন্য হাঁ করে ছিল এতকাল। ঈর্ষা হওয়া উচিত নয়। তবু আমার ঈর্ষা হচ্ছিল।

খাওয়ার পর দেখি, আঁচাতে গিয়ে রমেনের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে ঝিমি। থামের আড়ালে জলের বালতি। হংসধ্বজ হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন। থামের আড়ালে রমেন ও ঝিমির হাসি শুনতে পেলাম। হংসধ্বজ ঘব থেকে আমাকে ডাকছিলেন।

ভেতরে গেলে চাপা গলায় বললেন, রমেন দেখবে শিগগির পপুলার হয়ে যাবে এখানে। জনসেবার কাজে এটাই খুব দরকার। ওই রকম স্মার্টনেস। আলাপ্ত করার ক্ষমতা। মাসকমিউনিকেশনের জন্য কিছু কিছু গুণ থাকা ভাল। যেমন ধরো মিউজিক। এসব ওর আছে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে।

রমেন ও ঝিমি কি জ্যোৎস্নায় বেড়াতে গেল পেয়ারাতলায়? ওদের সাড়া নেই। নকুল কলতলায় কী একটা করছে যেন। বললাম, ভাঁটু বসে আছে। আমি না গেলে ওর বাড়ি যাওয়া হবে না।

ওরা কোথায় গেল? হংসধ্বজ ডাকলেন, ও ঝিমি!

ঝিমির সাড়া এল নেপথ্যে! ঝাঁপুইতলার ভূত দেখছি আমরা। দেখবেন তো আসুন আপনারা!

হংসধ্বজ হাসলেন। মেয়েটা এক পাগল। ভূত দেখার জন্য অস্থির। সত্যি সত্যি যেদিন দেখবে, সেদিন বুঝবে। বলে ফেব গলার স্বর চাপলেন। যা বলছিলাম। তোমার বন্ধুটি শিগগির পপুলার হয়ে যাবে। গ্রামসেবকের কথা বলছিল। তুমি নিশ্চয় চেনো—ওই যে ফাঁকিবাজ ইযংম্যান। খালি বাজারে বসে আড্ডা দেয়। কী নাম যেন—প্রতুল। হ্যাঁ, প্রতুলের কথা বলল রমেন। ওর সঙ্গে নাকি ব্লক অফিসে কথাবার্তা হয়েছে। তো আমি ফ্র্যাংকলি বললাম, প্রতুলের সঙ্গে আমার বাক্যালাপ বন্ধ। রমেন বলে কী, কালই ওকে টেনে নিয়ে আসবে আমার কাছে। রমেন, প্রতুল, তুমি, আমি—মন্দ হয় না। আর প্রতুলের সঙ্গে সামান্য কথাকাটাকাটি বৈ তো নয়। জাস্ট সরকারি পদ্ধতি ভার্সেস ব্যক্তিগত বেসরকারি পদ্ধতির ক্ল্যাশ!

এই বক্তৃতা সহজে শেষ হবে না জানি। ঝটপট পা বাড়িয়ে বললাম, ভাঁটুর নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে।

হংসধ্বজ হাসলেন। এই তো! এই তো গ্রামজীবন সম্পর্কে তোমার

অজ্ঞতার প্রমাণ। ওরা সন্ধ্যাবেলাতেই খেয়ে নেয়। তোমাকে আরও অবজার্ভ করতে হবে। ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হবে। না—না। তাই বলে বিলেবাদাড়ে রাতবিরেতে যেতে হবে না। আচ্ছা এস তাহলে। ভাঁটু ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ। এও কিন্তু গ্রামের লোকের একটা লক্ষ্য করার মতো স্বভাব। তুমি দেখেছ নিশ্চয়, পড়ার সময় অনেকে ঢুলছে। একদিন কী হয়েছিল শোনো—

হংসধ্বজের কাছে যখন মুক্তি পেলাম, তখনও রমেন ও ঝিমি জ্যোৎস্নায় ভূত খুঁজছে।

ভাঁটু সত্যি দেয়ালে হেলান দিয়ে প্রকাণ্ড ভুঁড়িতে থুতনি গুঁজে ঘুমোচ্ছিল। হ্যাজাগটা শোঁ শোঁ করে জ্বলছিল টুলের ওপর। নিভিয়ে দিয়ে লণ্ঠন জ্বালার কথা। হংসধ্বজ দেখলে বকাবকি করবেন। খামোকা হ্যাজাগে তেল পোড়ানো কেন ?

ভাঁটুকে জাগালাম না। ঝটপট চিঠিটা লিখে ফেললাম। ইচ্ছে ছিল বড় একটা লিখব। সেই ইচ্ছেটা যেন জোর পেল না। লিখলাম : 'কুন্তলা, আমি রাগ করিনি। তুমিও আমাকে ভুল বুঝেছ। তুমি লিখেছ, আমাকে তোমার কাছে যেতে সত্যি করে বারণ করোনি। বেশ, তাহলে আমি যে রাগ করিনি এবং তুমি যে সত্যি করে বারণ করোনি, তার বোঝাপড়ার জন্য আগামীকাল কোনো এক সময় তোমার বাড়ি চলে যাব। ইতি, মুকুলদা।'

চিঠিটা ভাঁজ করেছি, পেছন থেকে রমেন বলে উঠল, মেয়েটা কে রে ?

চমকে উঠে দেখলাম, সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মিটিমিটি হাসি। ভাঁটুকে ধাক্কা মেরে জাগাতে হল। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, অ—মাস্টোমশাই ! আমি ভাবলাম—

রমেনকে শুনিয়েই বললাম, এই নাও। চিঠিটা চিমনিকে দিও।

ভাঁটু চিঠিটা ভক্তিভরে নিয়ে ফতুয়ার পকেটে গুঁজে বেরিয়ে গেল। রমেন আমার কাঁধ খামচে ধরে বলল চিমনি ! কে রে সে ?

একটু হেসে বললাম, আছে। তা তোর খবর বল। কুইক প্রগ্রেস মনে হল।

রমেন এতক্ষণে তার চিরাচরিত তেতোভাবটা মুখে এনে বলল, ধুস ! তুইও যেমন।

কেন রে ? ঝিমির সঙ্গে জ্যোৎস্নার বাগানে প্রেমের ভূতটা দেখতে পাসনি বুঝি ?

রমেন নাক কুঁচকে ফের বলল, ধুস ! এখন মেঝেয় শোব কী ভাবে সেই প্রব্লেম। হ্যাঁ, রে, মশারি না খাটিয়ে শোয়া যায় না ?

না। ভীষণ মশা।

আমার যে মশারি নেই। কী হবে ?

আমারটায় ঢোক্ আজ। কাল একটা কিনে ফেলবি।

অনেক রাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে রমেন ফিসফিস করে বলল, মুকু ! কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। কে বললাম, সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা দেওয়া বন্ধ হল। ওই শোন ! আবার ধাক্কা দিচ্ছে।

বললাম, পাঁচুগোপালবাবু নাকি !

বসোবাবুর সাড়া পাওয়া গেল···বসন্ত, জেগে আছ ?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার ?

ভানুশালার ভয়ে চুপিচুপি এসেছি। বুঝলে বসন্ত ? চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেবে বলে শাসায় শুওরকা বাচ্চা। চোখে আঙুল ঢোকালে আমি কানা হয়ে যাবো না, বলো ?

তা তো যাবেই। কিন্তু ডাকছ কেন পাঁচুগোপাল ?

খুব খিদে পেয়েছে, ভাই !

বেশ তো চিমনির কাছে গিয়ে বলো !

মারবে যে !

না, না। তুমি গিয়ে বলো, ক্ষিদে পেয়েছে। মারবে না। খেতে দেবে।

বলছ যখন, যাচ্ছি। তবে তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

কাল দিনে এসে বলবে বরং !

দিনে তো তুমি থাকোই না। নদীর ওপারে চলে যাও। আমি ডেকে ডেকে সাড়া পাইনে।

না, না। কাল নদীব ওপারে যাব না। সকালে এসো, অপেক্ষা করব।

দিব্যি করো। মাকালীর দিব্যি—করো !

মাকালীব দিব্যি।

চলি তাহলে। বাই বাই !

বাই বাই ! টা টা !

রমেন কাঠ হয়ে শুনছিল। সব চুপচাপ হয়ে যাওয়ার পর ফিসফিস করে বলে উঠল, এসব কী ব্যাপার, মুকু ? আমাব মাথায় কিছু তো ঢুকছে না। এ কী আজব জায়গা রে ! স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ ! কী অদ্ভুত সব ডায়লগ !

বললাম, ঘুমো। ও একজন পাগল।

ধুস। তুই চিমনির কথা বললি। তাকেই তো চিঠি লিখছিলি তখন।

ভদ্রলোক চিমনির বাবা।

কে চিমনি?

একটি মেয়ে। ঝিমির মতো।

তার মানে তোর প্রেমিকার বাবাটি লুনাটিক এবং রাত্তিরে এসে এভাবে মিসট্রিয়াস কথাবার্তা বলে? হরিবল! ভাবা যায় না।

রমেন সিগারেট ধরালে বললাম, সাবধান। মশারিতে আগুন লাগাবি নে যেন।

রমেন শুধু বলল, এ কোথায় এলাম মাইরি! এখানকার সবকিছুই বড় মিসট্রিয়াস!

সকালে হংসধ্বজ এসে রমেনকে তার বাসা দেখাতে নিয়ে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরে নকুল এসে বলল, মাস্টোমশাই! বাবুদিদি আপনাকে ডেকে দিতে বলল।

কে?

ঝিমিবাবুদিদি গো!

একটু অবাক হয়ে হংসধ্বজের বাড়ি গেলাম। দেখলাম, ঝিমি খুরপি দিয়ে বাগানে একটা কামিনীফুলের গোড়ায় মাটি কোপাচ্ছে। সম্ভবত হংসধ্বজ তাকে বাগান পরিচর্যার কাছে লাগিয়েছেন। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। মুখটা গম্ভীর যেন। বললাম, কী ব্যাপার? নকুল বলল, আপনি ডেকেছেন!

ঝিমি ঠোঁট একটু বাঁকা করে বলল, ভুলে গেছেন, বলেছিলাম, তুমি বললে আমি মাইন্ড করব না। আচ্ছা, তাই। একটু হাসলাম। বলো কী ব্যাপার?

ঝিমি ভুরু কুঁচকে বলল, রমেনবাবু বলছিলেন আপনারা ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন?

ছিলাম।

ঝিমি আবার বলল। খুরপি দিয়ে মাটি কোপাতে কোপাতে বলল, আপনার বন্ধু ভদ্রলোক একেবারে আপনার অপজিট। বন্ধুত্ব হওয়াই উচিত ছিল না।

কেন—কিছু কি…

ঝিমি তাকাল আমার দিকে। আপনার বন্ধুভদ্রলোক একটা মাংকি। বুঝলেন? বঁয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দর।

সে কী! ওর ওপর হঠাৎ চটে গেলে কেন?

অসভ্য! ছোটলোক! ঝিমি চাপা গলায় গাল দিতে দিতে মাটিকে রমেন ধরে নিয়ে যথেচ্ছ খুরপির কোপ বসাতে শুরু করল। নাসারন্ধ্র ফুলে উঠল তার।

গানের সঙ্গে ভাল সঙ্গত করে বলে একটু খাতির করলাম তো—ব্যস ! আপনার বন্ধু ভদ্রলোককে বলবেন, ঝিমি কী জিনিস সে সামান্য টের পেয়েছে। দরকার হলে আরও পাইয়ে দেব।

আস্তে বললাম, অসভ্যতা করেছে বুঝি ? আসলে রমেন একটু—

থামুন ! বন্ধুর হয়ে আর সার্টিফিকেট দেবেন না।

আহা ! তোমরা তো দিব্যি কালরাত্রে জ্যোৎস্নায় ভূত দেখতে বেরিয়েছিলে। তারপর হঠাৎ কী হল ?

ঝিমি নির্বিকার মুখে বলল, চড় বসিয়ে দিলাম গালে।

সর্বনাশ !

আরও অনেক সর্বনাশ আপনার বন্ধুর বরাতে আছে, বলে দিচ্ছি।

কিন্তু তুমি কি আমাকেই শাসাচ্ছ, ঝিমি ?

ঝিমি গলা নামিয়ে আপনমনে বলল, 'ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি তো কলা খাইনি' করবেন না। আমাকেই শাসাচ্ছ ! আপনার সঙ্গে আমার কী হয়েছে যে আপনাকে শাসাব ?

সে উঠে গিয়ে যুঁইফুলের প্রকাণ্ড ঝাড়টার তলায় হুমড়ি খেয়ে বসল। নকুল একটু তফাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। চেঁচিয়ে বলল, বাবুদিদি ! বাবুদিদি ! অমন করে জঙ্গলে ঢুকবেন না। সেদিন ওখানে 'লতা' বেরিয়েছিল।

ঝিমি মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে। বুঝলাম ঝাঁপুইতলায় প্রচলিত লতা বা পোকার রহস্য সে জানে না। বললাম, লতা মানে সাপ।

ঝিমি ও ম্মা বলে ব্যালে নাচের ভঙ্গীতে ছিটকে সরে এল। এসেই সেদিনকার মতো ধপাস করে আছাড় খেল টালসামলাতে না পেরে। তারপর অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়াল। পশ্চাদ্দেশ ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, অমন করে ভয় দেখাবেন না তো !

নকুল এগিয়ে এসে বলল, না বাবুদিদি ! এ তল্লাটে লতার উপদ্রু পেচণ্ড ! মাস্টোমশাইকে জিগ্যেস করুন। স্বচক্ষেতে লতায় কাটা দেখেছেন কালীদ'র ধারে। লোকটা সেন্টারের ছাত্তর ছিল। ধড়ফড়িয়ে মুখে গেঁজলা উঠে মরে গেল। তাই না মাস্টোমশাই ?

ঝিমি আমার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। বলল, সত্যি দেখেছেন ?

বললাম, দেখেছি। কিন্তু সে তো অনেকদূরে। বসতি এরিয়ায় নয়।

বলুন না কী হয়েছিল ব্যাপারটা ?

পরে বলব'খন। বলে চলে এলাম। ঝিমিকে বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল বলেই

হয়তো।

গেট পেরিয়ে গিয়ে একবার ঘুরে দেখলাম, ঝিমি তাকিয়ে আছে তখনও। আর নকুল তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, না, না। ততকিছু ভয়ের নেই। সব লতার তো বিষ নেই কো। নৈলে বাবুমশাই কি এমন সুন্দর ফুলের বাগান করতে পারতেন ? আমনি ভয় করবেন না বাবুদিদি ! এট্টুখানি 'সতর্' করে দেওয়া 'রুচিত্'। তাই কল্লাম।

নকুল ছোটবেলা থেকে হংসধ্বজের কাছে আছে। হংসধ্বজ পাত্রী পছন্দ করে তার বিয়েও দিয়েছেন। ওই সহবাসের দরুন নকুল মাঝেমাঝে খুব ভদ্রভঙ্গীতে অর্থাৎ বাবুজনেরা যেভাবে বলেন, সেইভাবে কথা বলাব চেষ্টা করে। সংগৃহীত তৎসম শব্দ যত্ন করে ঢুকিয়ে দেয় বাক্যে। যদিও সেই শব্দ ঝাঁপুইতলার মাটির আদিম রঙে কেমন জেবড়ে যায়।

বারোয়ারিতলার কাছে গিয়ে ভাবলাম, চিমনিদের বাড়ি যাব নাকি ? রাতে চিঠি লিখে পাঠিয়েছি ! ভাঁটু যা লোক, নিশ্চয় রাতেই হয়তো ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সেটা পৌঁছে দিয়েছে। চিমনি কি আজ সারাটা দিন আমার অপেক্ষা করবে ? আমার বুকের ভেতর যেন প্রচ্ছন্ন এবং সতর্ক একটু সুখ ভেসে বেড়াতে থাকল। এটাই কি প্রেম ? এতকাল কারও প্রেমে পড়ার সুযোগ পাইনি, ইচ্ছে যতই থাক। এখন গ্রামীণ এক নির্জন পথে দাঁড়িয়ে ডাইনে আগাছার বনের ভেতর পায়ে চলা সরু পথের ফালিটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, প্রেমের রহস্যময় ভ্রমণের সূত্রপাত ওখানেই। কালকাসুন্দে, ঘেঁটুফুল, বনকরবীর ঝাড়, হংসধ্বজের বাড়ির নিচু পাঁচিল উপচে আসা হরগৌরীর ফুলন্ত শাখাপ্রশাখা আর বনতুলসীর পাশ কাটিয়ে দ্বিধার সঙ্গে পা ফেলতে ফেলতে ডাইনে ঘুরে দেখলাম, ঝিমি আবার মাটির দিকে ঝুঁকেছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে নকুল ক্রমাগত হাতমুখ নেড়ে তাকে যেন বরাভয় দিয়ে চলেছে।

এখনও চবচবে শিশিরে চপ্পল আর পাজামার নিচের দিকটা ভিজে যাচ্ছে। এদিকটায় এখনও ছায়া পড়ে আছে। সূর্য হংসধ্বজের একতালা বাড়িটার পেছনে গাছপালার ফাঁক দিয়ে পিচকিরির মতো ঝকমকে সোনালি রোদ ছড়াচ্ছে।

মাঝ অব্দি গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। এটা কি উচিত হচ্ছে ?

এই আগাছার জঙ্গলটা কাছিমের খোলের মতো। বাঁদিকে কয়েকটা নিচু জমি। সেখানে ধানক্ষেত। হেমন্তে সেই ধানক্ষেতের রঙটা হলুদ হয়ে গেছে। তার ওধারে বাঁজা ডাঙ্গার ওপর তালগাছের সারি আর ঝুরিবহুল সেই বটগাছ, যার ওপাশে ভাঙা শিবমন্দির, যেখানে কমলা ডোমনিকে বলি দেওয়া হচ্ছিল।

এখান থেকে গাছের আড়ালে চিমনিদের বাড়িটাও দেখা যাচ্ছে। বাড়িটাকে দেখতে দেখতে কেমন একটা অপরিচ্ছন্ন অনুভূতি জেগে ওঠে। প্রকৃতি হিংস্র জানোয়ারের মতো ওই একতলা জীর্ণ ইটের বাড়িটাকে কোণঠাসা আর করতলগত করে ফেলেছে। বাড়িটার কার্ণিশে, দেয়ালে, ছাদ জুড়ে মারমুখী সবুজ জ্বলজ্বল করছে সকালের রোদে। মনে হল, কুন্তলা বিপন্ন।

কিন্তু আমি গিয়ে পড়লেই কি উদ্ধার তার, এমন তো নয়। কেউ বিপন্ন হলে তাকে উদ্ধার করার ব্রতও কি আমি নিয়েছি? মনে হল, এটা ঠিক হচ্ছে না। এভাবে এগিয়ে যাওয়া মানে একটা নিছক খেলা ছাড়া আর কিছু হয়ে উঠবে না—ওই রমেন যে ধরনের খেলা খেলে, তাই।

হনহন করে হেঁটে ফিরে এলাম সেন্টারে। এসে দেখি, মুসলমানপাড়ার কাদির আলি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে আদাব দিয়ে বলল, রোজ বলেন যাব যাব। আজ আপনাকে না নিয়ে গিয়ে ছাড়ব না।

বললাম, বেশ তো! চলো।

কাদির আলিরা সম্পন্ন চাষী। কাদিরের বয়স প্রায় তিরিশ বছর। সে নিরক্ষর। হিন্দুদের মতো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। আবার চাষবাসেও খাটে। তার ভাইবোন অসংখ্য। তাদের মধ্যে কাদিরই ছোট। তার বাবার বয়স নাকি নব্বুই পেরিয়ে গেছে এবং ঝাঁপুইতলার সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষ। সেই দীর্ঘজীবী মানুষটাই আমাকে দেখতে চেয়েছে। রোজই বলি, যাব। কিন্তু ভাঁটুর পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় না।

রাস্তায় যেতে যেতে কাদির বলল, আজ মিস্তিরিদাকে দেখলাম মেজবাবুর বাড়ি কাজে লেগেছে। বেরং এক ছপ্পর খাটের মশারি খাটানো 'ট্যাণ্ড' থাকে, সেগুলান ভাঙা। মিস্তিরিদা ঘষরঘষর করে ঘিসকাপ্ ঘষছে দেখলাম। আর মেজবাবু কাছে দাঁড়িয়ে তম্বি করছে। করলে কী হবে? আমাদের মিস্তিরিদাও তো কম নয়কো। পাল্টা তম্বি চালিয়ে যাচ্ছে। সে যদি দ্যাখেন মাস্টোমশাই, হাসতে হাসতে—

কাদের খিখি করে খুব হাসতে লাগল।

মুসলমানপাড়াটা গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে। হিন্দুপাড়ার পর একটা প্রকৃত নোম্যানস ল্যাণ্ডের মতো পোড়ো জায়গা। সেখানে গ্রামের ছেলেরা ফুটবল খেলে। মুসলমানপাড়া থেকে মহরমের তাজিয়া এসে ওখানেই মিছিল বা জলুস শুরু করে। আবার হিন্দুপাড়ার পুজোর প্রতিমা ওখানেই এনে নাচানো হয় বিসর্জনের আগে। কাদির বলছিল, আমাদের ছোটবেলায় এ চটানে পিতিমে

নাচাতে আনত না বাবুরা। দ্যাশ স্বাধীন হবার পর এইরকম। তা আনছে, আনুক। পেথম-পেথম আমরা আপত্তি করেছিলাম। আর করি না। কী দরকার? তবে জায়গাটা ছিল খোঁড়াপীরের দরগার। শ্যাষে মীমাংসা হল মুরুব্বিদের মধ্যে। এমনি পড়ে আছে খালি-খালি। সবাই ভোগ করুক। ধরুন, হিঁদুপাড়ার ছেলেরা ফুটবল খেলে। আবার আমাদের ছেলেরাও 'হাঁড়িগুড়ু' (হাডুডু) খেলে।

জিগেস করেছিলাম কেন? মুসলমান ছেলেরা ফুটবল খেলে না?

কাদির হেসেছিল। পেটে বিদ্যে থাকলে পরে তো বাবুদের খেলা খেলবে! মুরুক্ষুদের বাবুদের ছেলেরা খেলতে নেবে ক্যানে বলুন?

তোমরা ছেলেমেয়েদের প্রাইমারি স্কুলে পড়তে দাও না?

দিয়েছি বৈকি। হালে একটা দুটো করে যাচ্ছে।

বিশাল চটানটার শেষপ্রান্তে ঘন গাছের জটলা। যেতে যেতে কাদির সেদিকটা দেখিয়ে বলল, ওই হল গে খোঁড়াপীরের দরগা। ফেরার সময় দেখিয়ে নিয়ে যাব। খুব 'জাগ্যাতো' পীর, মাস্টোমশাই। যা 'মানসা' করবেন, হাতে হাতে ফল পাবেন।

চলো, তাহলে আগেই একটা মানসা করে যাই! হাসতে হাসতে বললাম।

কাদির বলল, বাপজি আপনার অপিক্ষে করছেন, মাস্টোমশাই!

ঠিক আছে! যাচ্ছি তো। আগে চলো, দরগা দেখে আসি।

একটু অনিচ্ছার সঙ্গে পা বাড়াল কাদির। চাপা গলায় বলল, কালুফকিরের পাল্লায় পড়লে সহজে ছাড়বে না দেখবেন। গাঁজার পয়সা দিয়ে তবে আপনার নিস্তার।

কে সে?

দরগার খাদিম (সেবায়েত)। খুব বাজে লোক।

প্রকাণ্ড একটা কাঠমল্লিকার গাছ ফুলে ভরে আছে। তারপর ঢিবিমতো একটা জায়গার ওপর পুরনো ইটের কবর। চারদিক থেকে ফণিমনসা আর মাদার গাছ কবরটাকে ঘিরে ধরেছে। ওপাশে বট নিম অশ্বত্থের ঠাসবুনোট জঙ্গল। ঢিবিজুড়ে অসংখ্য ছোটছোট পোড়ামাটির ঘোড়া পড়ে আছে। একটু তফাতে একটা মাটির ঘর। খড়ের চাল। দাওয়া আর দেয়াল সুন্দর নিকোনো। দেয়ালে পদ্মফুল, পাখি আঁকা গিরিমাটি গুলে। দাওয়ায় বসে ছিল বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে কালো আলখেল্লা আর রঙবেরঙের মোটা-মোটা পাথরের মালা পরা একটা লোক। তার কাঁচাপাকার চুল আর দাড়ি দেখলে অবাক লাগে। চোখদুটো টকটকে

লাল। কাদির ফিসফিস করে বলল, ওই! কালুফকির আমাকে দেখে ফিক করে হেসে হাতের ইশারা করল।

ভদ্রতা করে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললাম, সেলাম ফকিরসায়েব।

কালু ফকিব বলল, আয় বাপ। এখানে বোস। দুটো মনের কথা কই।

কাদির চটে গিয়ে বলল, কাকে কী বলছ? ইনি আমাদের সেন্টারের মাস্টোমশাই। এম এ বি এ পাশ। বামুনঠাকুর। তা জানো? সবাইকে খালি তুই-তোকারি করে কথা!

ফকির বাঁকা হেসে বলল, আরে যা যা! কত জজবেলেস্টরকে তুইমুই করলাম তো এ তো সেদিনকার বাচ্চা! আয় বাপ, বোস!

বলে সে তড়াক করে উঠে চালের বাতা থেকে একটুকরো কম্বল পেড়ে বিছিয়ে দিল। বলল, বামুনেব ছেলে—বেদ পড়েছিস? বেদে লেখা আছে, পশমের আসন হল গে সব চেয়ে শুদ্ধ আসন। বোস বাপ।

বসলাম। কাদির একটু তফাতে উবু হয়ে বসল। তার মুখে বিরক্তির ভাব। ফকির হাত বাড়িয়ে বলল, সেক্রেট খাস তো একটা দে।

সিগারেট দিলাম। সে খুঁটিতে ঝোলানো ছেঁড়া কাঁথা দিযে তৈরি একটা ঝুলির থেকে দেশলাই বের করে ধরিয়ে নিল। প্রচণ্ড কাসতে থাকল। কাসি থামলে বলল, তোর মানসা পুন্ন হবে। তবে সহজে হবে না।

কী আমার মানসা ফকিরসায়েব?

থাম্, তবে বলি। বলে সিগারেটটা ঘষটে নেভাল কালুফকির। তাবপব আচমকা একটা কানে হাতের তালু চেপে ধরে মুখটা ওপরে তুলে সুরের চিক্কুর ছাড়ল, তা না না না না তা না না রি-হ-হ!

গাঁজা খেলে গলাটা চিড় খাওযা। কিন্তু সুরেলা। বোঝা যায় একসময় ভালই গাইতে পারত।

'ভাবের কথা বলি শোন বে মোনকানা/ভাবের বাগানে ফুল ফুটিয়ে বসে আছে একজনা...

তারভাবে ভাব লাগলে পবে তবেই হবে ভাবজানা...'

গান থামিয়ে মিটিমিটি রহস্যময় হেসে ফকির বলল, হা বাপ! বিস্তর ল্যাখাপড়া তো শিখেছিস। আঁকও কষেছিস। যোগ কষেছিস। বিয়োগ কষেছিস। এ সেই যোগবিয়োগের খেলা, মাণিক। ভাবে ভাব যোগ দিলি তো পেলি। বিয়োগ দিলি তো হাতে রইল কাঁচকলাটি। বুড়ো আঙুল নেড়ে দিল আমার নাকের ডগায়।

বললাম, কিছু বুঝলাম না ফকিরসায়েব !

কাদির বিবক্ত হয়ে বলল, আপনিও যেমন মাস্টোমশাই ! কী সব আবোল-তাবোল শুনে—

কালু ফকির গর্জন করে বলল, চোওপ্ ! বাপ্, ওই গাধাটাকে তুই মানুষ কববি ভেবেছিস ? পারবি নে। এককলম লিখে দিলাম এই দ্যাখ।

সে শূন্যে লেখার ভঙ্গী করল। বললাম, চলি ফকিরসায়েব।

আমাব হাত ধবে টেনে বসিয়ে দিল সে। বলল, শুনে যা রে শুনে যা। ভাবের পথে পা দিয়েছিস, ভাবেব কথা শুনে যা দুটো।

একটু চমকে উঠলাম। বললাম, কী ভাব ? কিসেব ?

ফকিব হেসে আকুল হল ! ওবে, ওবে ! ব্যাটা আমার বলে কী শোন ! কী ভাব, কিসেব ভাব ' আবার সেই তা না না না শুরু কবল সে কানে হাত চেপে।

'মানবদেহ বিন্দাবনে/ভাবেব খেলা নিশিদিনে...

যেমনি পাবি ধর্বি কসে ভাবেব বশি ছাড়বি নে

শোন রে মোনকানা ॥'

গান শেষ করে কথায় বলল, ধরেছিস তো শক্ত কবে ধবে থাক। ছাড়লে পস্তাবি বাপ।

কাদিব খি খি কবে হাসতে লাগল। বসোবাবু এক পাগল, আর এই এক পাগল।

বললাম, ভাব কী আমি জানি না। জেনেও দরকার নেই। চলি ফকিবসায়েব।

কালুফকির বলল, ব্যাটা আমাব খুব চালাক ছেলে ! হবে না চালাক ? এম এ বি এ পাশ করেছে ! ওবে বাবা ! কতবড় বিদ্বান ! তবে যাই বলিস বাপ, আমি তোর কলজেয় হাত দিয়েছি ! কেমন ? বল, বলে যা ঠিক কিনা।

কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধে মউমউ করছে খোঁড়াপীড়ের দরগা। অজস্র ফুল ছড়িয়ে আছে মাটিতে, ঘাসে। পা বাড়িয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল। চিমনিকে মনে পড়ে গেল। কালু ফকির কি তার জন্যই কোনো আভাস দিল ? কিন্তু সে কেমন করে জানবে ? বুজরুকিতে বিশ্বাস করতে হবে নাকি এতদিন পরে এই ঝাঁপুইতলায় এসে ?

যেতে যেতে কাদির বলল, গাঁজাখোর। সব সময় ওইরকম হেঁয়ালি। তবে দেখলেন ? আপনাকে সাওস করে পয়সা চাইতে পারলে না ?

একট পরে সে চাপা গলায় জিগ্যেস করল, কিছু মানসা করে এলেন তো ?

উঁহু ।

করলে ফল পেতেন । খোঁড়াবাবা কারুর মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না । আমি জানি ।

ভাবছিলাম, কী 'মানসা' করতে পারতাম । চাওয়ার ছিল কী ? হ্যাঁ—একটা ভাল চাকরি । তার চেয়ে বড় কিছু এখন আর চাওয়া সাজে না আমার ।...

কাদির আলির বাড়ির সামনের চত্বরে একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ । তলায় একটা বাঁশের মাচান । মাচানে বসে প্রচণ্ড বুড়ো একটা মানুষ, কুঁজো তার পিঠ, অস্থিচর্মসার, শুধু তার শাদা চুলদাড়িই বেশি চোখে পড়ে, শনের দড়ি পাকাচ্ছিল একটা 'ঢ্যারা' দিয়ে । ঢ্যারা জিনিসটা আড়াআড়ি দু' টুকরো সরু চাঁছাছোলা কাঠ । দেখতে গুণের চিহ্নের মতো । এখানে আসার পর জিনিসটা অসংখ্যবার অনেকের হাতে দেখেছি । অবসর সময়ে ওরা দড়ি তৈরি করে ওই দিয়ে । যেখানে যায়, সঙ্গে একগোছা পাট বা শন আর ওই ঢ্যারা । কেউ চুপচাপ বসে আড্ডা দেয় না । আড্ডা দিতে দিতেও হাত চালিয়ে যায় গেরস্থালির অসংখ্য কাজে ।

কাদির বলল, বাপজি । এই দ্যাখো, আমাদের মাস্টোমশাইকে এনেছি ।

বৃদ্ধের ভুরু ঘন এবং শাদা । ঘোলাটে চোখ । দেখার চেষ্টা করে বলল, বসুন বাবা, বসুন । কাদু, কম্বল এনে দে শিগগির ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেল আমাকে কেন্দ্র করে । কাদির আলির বাবা তার ছেলেবেলার গল্প শুরু করেছিল । সে ছেলেবেলায় 'বেউলো' গানের দলে বেউলা (বেহুলা) সাজত । ধনো বাগদি, যে সাপের কামড়ে মারা গেছে, তার ঠাকুদা সাজত নখাই বা লখিন্দর । আর চাঁদ সদাগর সাজত হরিপদ বাউরির বাবা কালীপদ । হরিপদও এখন থুথুড়ে বুড়ো । তারপর এক মৌলবি এসেছিলেন উত্তরমুলুক থেকে । এসে বেউলোসুন্দরীর চুল কেটে দিলেন । মুসলমানপাড়ায় যারা দলে ছিল, সবাইকে নাকখত দিয়ে মসজিদে ঢোকালেন । কাদির আলির বাবার হাসির সঙ্গে সবাই হাসি মেলাল । গল্পটা শেষ করে বৃদ্ধ বলল, এটা কত সাল হল মাস্টারমশাই ?

বললাম, বাংলা কত জানি না । ইংরেজি ১৯৫৯ ।

ভিড় থেকে কেউ বলল, বাংলা ১৩৬৬ ।

শ্বাস ফেলে বৃদ্ধ তাকে জিগ্যেস করল, পাকা মসজিদ কত সালে হয়েছে খবর রাখো ?

লোকটি কাচরমাচর করে পান চিবুচ্ছিল । মাথার মাঝখানে সিঁথি । চুলে তেল

চকচক করছে পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। আবার থুতনিতে একটুখানি দাড়িও আছে। পকেটে নোটবই আর কলম গোঁজা। পানের পিক ফেলে বলল, মসজিদের ফটকের মাথায় লেখা আছে সন ১২৮৪। ফাল্গুন মাসের ১৭ তারিখ।

বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের পাড়ায় এই মকবুল হোসেনই হল ল্যাখাপড়া জানা লোক। তোরাপ হাজির ছেলে বলেই ওইটুকুন হয়েছিল। তা যা বলছিলাম মাস্টারমশাই, ওই বছর মৌলিবিসাহেব আমার বিভা দিয়েছিলেন। তাইলে বুঝুন, সে কবেকার কথা। সে ছিল বড় সুখের দিন, বড় ভাল দিন। আর আজ? সব পচে ভুটভুট করছে।

বলে সে হঠাৎ মকবুল হোসেনের দিকে ঘুরল। ওই যে দেখছেন। বারোমাস কোটকাছারিতে পড়ে থাকে। ব্যাটা আমার ল্যাখ্যাপড়া শিখে ওইটুকুন শিখেছে। সেজন্যে হাজিকে ঠাট্টা করে বলি ল্যাখ্যাপড়া শিখলেই তো তোমার ব্যাটার মতো সবাই মামলাবাজ হবে। ক্যানে আর ও রাস্তা দেখাচ্ছে?

বৃদ্ধ হাসতে লাগল। কিন্তু মকবুল হোসেন খুব চটে গেল। সে হাতমুখ নেড়ে বলল, বিদ্যার মর্ম তুমি কী বুঝবে? চিরটাকাল তো দড়ি পাকিয়ে আর পিঠ বেঁকিয়ে মাটি শুঁকে কাটালে।

কাদির আলি বেগতিক দেখে তাকে ঠেলতে ঠেলতে দূরে রেখে এল। বৃদ্ধ ডাকল, মাস্টারমশাই!

বলুন চাচা!

চাচা শুনে খুব খুশি হল কাদির আলির বাবা। বলল, একটা কথা মুখোমুখি বলার জন্য ডাকা। সেদিন হাঁসুবাবু এসেছিল পাড়ায় আপনাদের সেন্টারের ছাত্তর খুঁজতে। তাকেও বলেছি, আপনাকেও বলছি এই কাজটা আপনারা ঠিক করছেন না।

কী কাজ বলুন তো?

কাদের হারামজাদাকে দু' হরফ যেই শিখিয়ে দিয়েছেন, অমনি তার তেজ বেড়ে গেছে। দলিলপরচা বের করে ভাইদের সঙ্গে দুবেলা কাজিয়া, মারামারির উপক্রম। নিজের বাপকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না। বলে কী, এই তো দলিল পরচায় ল্যাখা আছে অমুক পলটে এত ডেসিমেল জমি। বুঝুন তাইলে!

এতক্ষণে বুঝলাম বৃদ্ধ কেন আমাকে দেখতে চেয়েছে। কাদির আলিও বুঝতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সে প্রচণ্ড বিব্রত বোধ করছিল সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ সমানে লেখাপড়ার দোষগুলো দেখিয়ে চলেছে। তার মতে, একেবারে বড় সড় পাস দিয়ে বাইরে চাকরি করতে গেলে সেটা ভালই। কিন্তু

পাস না-দেওয়া এইরকম বিদ্যা অর্থাৎ অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। লাঠালাঠি বেধে যাবে ঘরে-ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়। কেন না, কেউ কাউকে মানতে চাইবে না। তাছাড়া—বৃদ্ধের ধারণা, পেটে এককলম বিদ্যা ঢুকলেই মানুষ বাবু হয়ে যায়। গতর খাটাতে লজ্জা পায়। সখ চাপে মাথায়। টেড়ি বাগাতে শেখে। তাতে চুলে বেশি তেলখরচা। সাবান ঘষতে চায়। ভাল কাপড় পড়তে চায়। বৃদ্ধের ভাষায় 'আংখা' অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। যেমন বেড়ে গেছে কাদের আলির। সে 'বাবুর ব্যাটা বাবু' হতে চাইছে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে চায় না। মাঠে কাজ করতে করতে পড়া মুখস্থ করে। এই করে সে নিড়ান দিতে গিয়ে কত ধানের গুছি উপড়ে ফেলেছে আনমনে, তার হিসেব নেই। হাঁসুবাবু এই ঘোড়াবোগ ছড়াচ্ছেন ঝাঁপুইতলায়। তিনি না হয় বাবু মানুষ, বড়লোক মানুষ। তাঁর চলবে। এদের চলবে? এরা খেটেখাওয়া মানুষ। এদের মাটি শুঁকেই জীবন কাটাতে হবে না বুঝি?

কাদের আলি বাবার দিকে এমন চোখে তাকাচ্ছিল মাঝে-মাঝে যেন আমি না থাকলে বৃদ্ধকে তুলে ওই পানাপুকুরে ছুঁড়ে ফেলত।

মকবুল হোসেন আমার কাছে এসে বলল, উঠে আসুন মাস্টারমশাই। চলুন, আমি বাজারের দিকে যাব। বাস ধরতে হবে। কথা বলতে বলতে যাই, চলুন।

কাদেরও গলার ভেতর বলল, আসুন।

পথে যেতে যেতে সে হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। আমি অবাক। মকবুল তার কাঁধে হাত রেখে বলল, চুপ করো, চুপ করো। সেকেলে মানুষ। ওদের কথা ধরতে আছে?

কাদির আমার পা ছুঁতে এল।...মাস্টোমশাই! আমি কিছু বুঝতে পারিনি। আপনার অপমান হল!

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, নানা। আমি রাগ করিনি। এতে অপমানেরও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তুমি আমাকে কথা দাও, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করবে না গিয়ে!

কাদির চোখ মুছে বলল, না! ঝগড়া করে কী লাভ?

মকবুল হাসতে লাগল। পাড়ায় কাদিরের নাম কী রেখেছে জানেন? কাদুপণ্ডিত! বেচারাকে মেয়েরা পর্যন্ত ঠাট্টা করে কাদুপণ্ডিত বলে।

বললাম, আপনাকে ঠাট্টা করত না কেউ?

মকবুল জোরে মাথা নেড়ে বলল, না। কারণ আমি ছোটবেলায় প্রাইমারি স্কুলে পড়েছি। পরে ক্লাস সেভেন অব্দি পড়েছিলাম গোপগাঁয়ের হাইস্কুলে।

মামুর বাড়ি থাকতাম। মায়ের এক ছেলে। মা কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না। তখন এমন পাকা রাস্তাঘাট ছিল না। বাস ছিল না। কাজেই আমার লেখাপড়াও আর হল না। চলে আসতে হল।

হুঁ, তাহলে বেশি বয়সে বলেই কাদের আলির সমস্যা! হাসতে হাসতে বললাম। কাদের আলির ছেলেমেয়েদের অবশ্য সে সমস্যা নেই।

মকবুল কাদিরের দিকে তাকিয়ে তামাসা করে বলল এ বয়সে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকলে যা হয়। তবে মাস্টারমশাই, যেযুগ এসেছে, লেখাপড়া যে না শিখবে, সেই ঠকবে। ঝাঁপুইতলায় লেখাপড়ার চর্চা বরাবর কম ছিল। শুধু জমিদারবাবুদের বাড়ি যৎসামান্য, আর কায়েতবাবুদের কয়েকটা ঘরে। জমিদারের ছেলেরা বড়জোর ম্যাট্রিকটা টেনেটুনে দিয়ে থাকবে কেউ। বড়বাবুর ছেলে তিনটেতো ভাল করে নামসই করতেও পারে না। ছোটবাবুর ছেলেপুলে নেই। সাতটা মেয়ে। মোটে দুটোর বিয়ে হয়েছে। বাকিগুলো বুড়ি হতে চলল আর লেখাপড়া বলতে প্রাইমারি পর্যন্ত। শুধু মেজবাবু চন্দ্রকান্ত বাঁড়ুয্যের দুই মেয়েই যা শিক্ষিত। বড় মেয়েটা বোধ করি কলেজ অব্দি পড়েছিল। পাত্র খুঁজছে ছোট মেয়েটার। সে কলেজে পাস দিয়েছে।

গ্রামের বড়রাস্তার মোড়ে পৌঁছে মকবুল চলে গেল আদাব দিয়ে হাইওয়ের দিকে। তারপর কাদির বলল, কী মনে হল মকবুলকে?

কী মনে হবে? বেশ চালাকচতুর।

হ্যাঁ। তা তো বটেই। তবে হাঁসুবাবুর দে-পার্টি। মেজবাবুর দলের লোক। কাদের বেজার মুখে বলল। এই যে গেল—জানবেন, কাকে বাঁশ দিতে গেল। বাজারে গেলে দেখতে পেতেন, ওর জন্যে পথ তাকিয়ে বসে আছে পেমথবাবু। দুই পাড়ার দুই বদমাস। খালি লোকের পেছনে লাগাই ওদের কাজ।

সেন্টারে পৌঁছে দিয়ে আবার ক্ষমা চেয়ে কাদের আলি চলে গেল। ওকে বারবার নিষেধ করলাম যেন ফিরে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি না বাধায়।

সেন্টারের সামনে ভানু ধর দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, হালগুড়বাবু বাজারে ঘর পেয়ে চলে গেলেন একটু আগে। হাঁসুবাবুও এসেছিলেন। আপনার খোঁজ করছিলেন।

ঘরে তালা দেওয়া থাকে না। যে যখন খুশি এসে লেখাপড়ায় বসে যায়, তাই। তাছাড়া চুরি-চামারি হবার কারণও নেই। হাঁসুবাবুকে এ পাড়ায় সবাই দেবতার মতো মানে। পেটের জ্বালায় গ্রামের মানুষ ছিঁচকে চুরিচামারি করে। যারা করে, তাদের নিয়েই থাকেন হংসধ্বজ।

ঘরে ঢুকে ওপাশের জানালার কাছে গিয়ে সবে সিগারেট ধরিয়েছি, ঝিমির সাড়া পেলাম বাইরের চত্বরে। ভানু ধর বলল, ভেতরে চলে যান দিদি। এইমাত্তর ফিরেছেন মাস্টোমশাই!

ঝিমি ঘরে ঢুকে চার দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, এই আপনাদের সেন্টার। আমি ভেবেছিলাম জিনিসটা কী? আচ্ছা মুকুলবাবু, সেন্টার কেন বলে বলুন তো?

বললাম, ওটা সংক্ষিপ্ত নাম। অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার থেকে শুধু সেন্টার।

ঝিমি ভুরু কুঁচকে বলল, এইটুকু জায়গায় মেয়েদের ক্লাস কোথায় হবে? পার্টিশান দিলে তো হোপলেস!

জ্যাঠামশাই ব্যবস্থা করবেন, ভেবো না।

ঝিমি হঠাৎ চোখে হাসল। এই! জানেন? আপনার সেই মাংকিফ্রেণ্ড চলে গেল? আমাকে টা টা করাব চেষ্টা করছিল। আমি তাকিয়েও দেখি নি। ওসব লোককে দেখলে পর্যন্ত ঘেন্না হয়।

কিন্তু তবলা বাজায় ভাল। অস্বীকার করতে পারবে না।

ঝিমি আমার দুষ্টুমি টের পেয়েই যেন খুব সিরিয়াস হয়ে গেল। আচ্ছা, আপনাদের ছেলেদের কী ধারণা বলুন তো মেয়েদের সম্পর্কে? তবলাটবলা কোনো কোয়ালিফিকেশান নয়। তবলা বাজিয়েছে আর আমি নেচে উঠেছি! আমাকে কিনে নিয়েছে! বাঃ!

জানালা দিয়ে ধোঁয়া ছুঁড়ে বললাম, না। তোমাকে কেনা শক্ত।

শক্তই তো! এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক।

আহা, সেই তো বলছি। তুমি নাটও নও, কংক্রিট।

ঝিমি ফের ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, আমাকে কী ভেবেছেন বলুন তো? খালি সবসময় জোক করেন আমার সঙ্গে। প্রথমদিন থেকেই!

বলেই সে জোরে, কিন্তু নিঃশব্দে ছিটকে বেরিয়ে গল ঘর থেকে। কিছু বলবার সুযোগ পেলাম না। যদি বা বলতাম, ভানু ধর চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে।

দুপুরে হংসধ্বজের বাড়ি খেতে গিয়ে ঝিমির পাত্তা পাইনি। হয়তো ঘরের ভেতর ছিল, রাগ করে দেখা দেয়নি আমাকে। খেতে বসে হংসধ্বজ বলেছিলেন, তোমার দক্ষিণাটা আজই দেওয়া যায় কি না ভাবছি। একটু

অসুবিধেয় পড়ে গেছি হঠাৎ। আসলে গ্রামাঞ্চলে বর্ষার পর থেকে দু-তিনটে মাস একটু হাতটান ট্রাডিশানাল। চাষীদের মধ্যে ছড়া আছে 'আশ্বিন-কার্তিক মাসে রাজার মাসির হাতের কাঁকন খসে।' বুঝতে পারছ ভাবার্থটা? ইনসিওরেন্সের টাকাটা পেয়েছিলাম। কবে কিসে কিসে শেষ। এখন ধান ওঠার অপেক্ষা। আমার বিঘে আষ্টেক জমি। ভাগে দেওয়া আছে। মাঠে ধানটা ওঠে আর খামার থেকেই নিকিবিকে নিজের শেয়ারটা বেচে দিই। 'ডিসট্রেস সেল' বলে একে। অভাবে বিক্রি। তখন একেবারে দর থাকে না। তবু উপায় কী? সামান্য কিছু খোরাকি রেখে ঝেড়ে দিই। ঝামেলা পোয়াতে পারি নে। কাজেই এ মাসটা একটু স্যাক্রিফাইস করো। তারপর আর অসুবিধে হবে না।

আমার গলায় খাদ্য ঢুকছিল না। চুপ করে ছিলাম।

হংসধ্বজ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, না—সেভিংস আছে কিছু। আমাকে তত বোকা ভেবো না। তবে নেহাত দায়ে ঠেকলে ওতে হাত দিই। বনবিহারী একটা বিশাল দায় চাপিয়ে দিয়ে গেল—অবশ্য, আমি নিজেই স্বার্থের জন্য নিলাম মাথায়। কার কথা বলছি বুঝেছ? ঝিমির, দেখা যাক।

তারপর কিছুক্ষণ রমেনের কথা হয়েছিল। রমেনের খুব প্রশংসা করেছিলেন হংসধ্বজ। গ্রামসেবক ভদ্রলোকও তার সঙ্গে একই ঘরে থাকছেন। বাজারে ঘরের ভাড়া মওকা বুঝে প্রচণ্ড হেঁকেছে। তবে রমেন আর গ্রামসেবক মিলে সেন্টারের জন্যও খাটবে বলেছে। সবরকম সহযোগিতা করবে তারা। হংসধ্বজের মতে, ওরা সরকারি লোক হওয়াতে একটা সুবিধে, লোকে ওদের কথা শুনবে। টেস্টরিলিফ, ড্রাইভোল এসব ব্যাপারে গ্রামসেবকের তদারকি দায়িত্ব আছে। কাজেই গরিব লোকেদের লেখাপড়া শেখার জন্য চাপ দেওয়া হবে। হংসধ্বজের মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ঝলমল করছিল।

বিকেলে ভাঁটু মিস্ত্রি এল থপথপ করে হেঁটে। বলল, হাঁসুবাবু ডেকেছেন। শিগগির আসুন।

কী ব্যাপার?

ভাঁটু হাসল। গিয়েই দেখবেন।

হংসধ্বজের বাড়ির দিকে যেতে যেতে বললাম, চলো ভাঁটু! আজ নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি। অনেকদিন যাইনি। তালগুড়বাবুকেও সঙ্গে নেব বরং।

ভাঁটু আস্তে বলল, চিমনিদিদির সঙ্গে সকালে দেখা হয়েছিল আবার। চিঠি তো রেতের বেলায় দিয়েছিলাম। মেজবাবুর টানাটানিতে আজ অগত্যা যেতে হয়েছিল—

শুনেছি। কাদির আলি বলছিল।

ভাঁটু সে কথায় কান না দিয়ে বলল, রাস্তায় চিমনির সঙ্গে দেখা। বললাম, কোথা যাচ্ছ গো? বললে গোপগাঁ যাচ্ছি। বিকেলে ফিরব।

গোপগাঁ কেন জিগ্যেস করোনি?

ভাঁটু হাসল। জানি তো জিগ্যেস কবব ক্যানে? বলক আপিসে মেয়েদের জন্যে 'টেনিং' সেন্টার করেছে। দরখাস্ত করে দরখাস্ত করে চিমনিব হাত ব্যথা। এখনও হল না। গেরামসেবকবাবু লিখে দিয়েছিল নাকি। তবু হচ্ছে না। আমাকে তো কোনো কথা লুকোছাপা করে না। সবই বলে। কাজেই আমি জানি।

কিসের ট্রেনিং জানো?

ভাঁটু মাথা নেড়ে বলল, তা জানি না অবিশ্যি। কী সব ইংরিজি খটোমটো কথা। বুঝতে পারিনে।

হংসধ্বজ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার অপেক্ষায। একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিযে আমাব বুকপকেটে ভাঁজকরা কিছু নোট গুঁজে দিয়ে চাপা গলায বললেন, পঁচিশটে টাকা ম্যানেজ করলাম কোনোক্রমে। আব দু'তিনটে দিন ওয়েট করো, বাবা। এ বুড়োর অনুরোধ। মাস পূর্ণ হলেই তোমার দক্ষিণা মেটানো আমার কর্তব্য। অথচ হঠাৎ একটু অসুবিধেয় পড়ে গেছি। তবে আই অ্যাসিওর, ভবিষ্যতে আর এমন হবে না।

বললাম, থাক না। পরে বরং—

হংসধ্বজ করুণ স্বরে বললেন না, না। তোমারও তো টাকার দরকার। বাড়িতে মা আছেন। তিনিও প্রত্যাশী। তুমি কাল বরং মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দাও। বাকি টাকাটা দিলে তখন একদিনের জন্য বাড়ি ঘুরেও আসতে পারো।

শ্রদ্ধায় এই লোকটির পায়ে নত হব, নাকি রাগেক্ষোভে অপমান করে চলে যাব? কিছু পারলাম না। এই লোকটি সারাজীবন এইসব অদ্ভুত-অদ্ভুত কাজ করে আসছেন। আদর্শবাদ? জানি না, আদর্শবাদ মানুষকে কী দেয়। হয়তো দেয় কিছু, নৈলে এই বৃদ্ধ কেন এসব করছেন? এটাই যেন ওঁর একধরনের শৌখিনতা কিংবা নেশা। কেউ মদ খেয়ে নেশা করে। কেউ একটা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য লড়ে যায় এবং সেও একটা নেশা।

পা বাড়াচ্ছি, তখনও হংসধ্বজ করুণ স্বরে বলছেন, কিছু মনে করোনি তো মুকুল?

না জ্যাঠামশাই।

হাঁটতে হাঁটতে ভাঁটু চাপা স্বরে বলল, টাকার অসুবিধেয় পড়তেন না হাঁসুবাবু। ওই যে ওবারসিয়ের বাবু এল। যখনই আসে, টাকা ধার নিয়ে যায়। হাঁসবাবুও তেমনি লোক। এবার এসে দু-দুশো টাকা ধার নিয়ে গেছে।

ওর দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছি দেখে ভাঁটু একটু হাসল। আমি জানব না তো কে জানবে? কিছুক্ষণ আগে আমার বাড়ি গিয়ে হাজির হঠাৎ। সবে মেজবাবুর কাজটুকুন সেরে বাড়ি ফিরে দুমুঠো খেয়েছি, তখন। টাকা হাওলাত করতে আমার কাছে! হা ভগবান! সূয্যি কোন বাগে উঠল গো?

ভাঁটু কপালে থাপ্পড় মারল। মুখে দুঃখ ক্লিষ্ট হাসি। সব বললেন আমাকে। ওবারসিয়ের বাবুর কথা বললেন। তার ওপর মেয়ের বিয়ের দায় চাপিয়ে গেছে, তাও বললেন। আসলে কাউকে মুখের ওপর না করতে পারেন না তো! এই যে ধান উঠবে মাঠ থেকে। খাবার জন্য কিছু ধান এনে রাখবেন ঘরে। তারপর বর্ষার মুখে যদি কেউ গিয়ে একটু কান্নাকাটি করেছে, তো তাকে সেই মুখের অন্ন থেকে ধান হাওলাত দেবেন। কিন্তু দুঃখ কী জানেন? সবাই মিঠে কুলের আঁঠি সুদ্ধু চিবিয়ে খায়। ফেরত কেউ দেয় না। ইদিকে বাবুমশাইও এমন মনভোলা লোক, তিনিও ফেরত চাইতে ভুলে যান। এই হল অবস্থা!

বুকপকেটে নোটগুলো অসহ্য লাগছিল। টাকা পেয়ে মানুষ খুশি হয়। আমার মতো মানুষের তো পিঠে দুটো ডানা গজিয়ে যায়। পৃথিবী হয়ে ওঠে নির্ভরযোগ্য এক বাসস্থান। অথচ এখন মনে হচ্ছিল আমার শরীরটা ধু ধু জ্বলে যাচ্ছে। কান গরম হয়ে গেছে। গরম শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে। যে পৃথিবীতে আমি জন্ম নিয়েছি, এখন যে পৃথিবীর ওপর পা ফেলে হাঁটছি, তা এক আগুনের গোলা। ভাঁটুর কাছে ধার করে আমার মাইনে মেটাতে হচ্ছে হংসধ্বজকে!

ভাঁটু আস্তে বলে উঠল, ধান উঠলে ধনীগরিব সকলের হাতে টাকা হবে। মাঠের মুনিশও দুটো টাকার মুখ দেখবে। তখন বরঞ্চ সেন্টারের জন্যে চাঁদা তুলব। বাবু মশাই বাধা দেবেন। আমরা শুনব না।

মনে হল সে লেখাপড়া শেখার আগ্রহে নয়, আমার মুখ চেয়েই এই কথাগুলো বলল

কিন্তু আমার চুপিচুপি চলে যাবার পথটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল তাহলে। কোন মুখে চলে যাব—লুকিয়ে? আবার কোন মুখেই বা প্রকাশ্যে বলব, আমার এতে পোষাবে না। তাই চলে যাচ্ছি। আমি জানি, আমার টাকা দরকার। টাকার লোভেই এই গ্রামে ছুটে আসা। কিন্তু এখন যদি চলে যাই, আমি শুধু হংসধ্বজের কাছে নই, আরও অসংখ্য মানুষের চোখে ছোট হয়ে যাব। তারা আমাকে

স্বার্থপর ভাববে।

আর চিমনি লিখেছে, আমাকে সে আদর্শবাদী বলে বিশ্বাস করে। চিমনির কাছেও কি ছোট হয়ে যাব না? আমি আদর্শবাদী নই কোনোদিনও। তবু চিমনির চোখে আমার সেই অলীক প্রতিবিম্ব ধরে রাখার জন্য এ মুহূর্তে আমি ভণ্ডামি করতেও রাজি।

কিংবা আদর্শের জন্যও নয়, নিজেকে দীনতা থেকে বাঁচাতেই এই গ্রামে আমাকে থাকতে হবে—যতদিন না ওরা নিজেরাই আমাকে চলে যেতে বলে।

হাইওয়ের ধারে বাজারে কোথায় রমেনের বাসা, ভাটু জানে। একেবারে শেষ দিকটায় প্রাইমারি হেলথসেন্টারের মুখোমুখি নতুন একটা একতলা বাড়ি। একটা অংশে সেটলমেন্ট অফিস। ঘরের দরজায় নতুন তালা ঝুলছে দেখে বুঝলাম রমেন বেরিয়েছে।

ভাটু বলল, তপনের কাছে চা খেয়ে তবে নদীর ধারে যাব। কী বলে

ব্লক অফিস থেকে অডিও-ভিস্যুয়াল ইউনিট সিনেমা দেখাতে এসেছিল। সেন্টারের চত্বর ছাপিয়ে বারোয়ারি-তলা ছাড়িয়ে সে-রাতে লোকজন থৈ থৈ একেবারে। দেখছিলাম, ভাটু মিস্ত্রি মাথায় লাল গামছার পাগড়ি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে। বাজপড়ার মতো চোওপ চোওপ করে গর্জাচ্ছে মুহুর্মুহু। মেয়েদের জায়গা সামনের দিকে। বাবুপাড়ার মেয়েরাও এসেছে। তাদের জন্য একটু আলাদা ব্যবস্থা। গ্রামসেবক তপনবাবু ব্যস্ত হয়ে এদিক থেকে ওদিক করে বেড়াচ্ছেন লোকের ভিড়ের ভেতর গুঁড়ি মেরে শেষপ্রান্তে চলে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন। রমেন সেন্টারের দরজার পাশে আমার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। তার নাকের ডগা কুঁচকে যাচ্ছিল ভিড় দেখেই। বলছিল, এ কী বাইরি! সিনেমা দেখার এত লোক! আস্ত রাক্ষসের মতো সব হাউমাউখাউ করছে দেখছিস?

ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, এই সব গ্রামীণ মানুষের জীবনে আনন্দটা বড্ড কম। তাই যে কোনো তুচ্ছ উপলক্ষেই এরা চঞ্চল হয়ে ওঠে আনন্দিত হবে বলে। আর এই জ্যান্ত ছবি দেখার আনন্দটা তো এদের কাছে তীব্র একটা অভিজ্ঞতা। নিজেদের পরিবেশে বসে এরা ছবির মানুষের জীবন দেখতে পাচ্ছে। তাই একটু হইচই হতেই পারে।

রমেন হঠাৎ গলা চেপে বলল, এই, দ্যাখ তো ওই মেয়েটা তোর সেই চিমনি নাকি?

বিদ্যুতের আলোয় সামনের দিকে বাবুপাড়ার মেয়েদের ভেতর ছিমছাম এবং জোরালো চেহারার একটি মেয়েকে দেখাচ্ছিল সে। দেখে বললাম, না। কিন্তু চিমনি সম্পর্কে তোকে একটু ভদ্র হতে বলব রমেন।

রমেন কান না করে বলল, আউটসাইডার মনে হচ্ছে ঝিমির মতো। লোকাল সয়েল থেকে এ জিনিস প্রডিউস হতেই পারে না। ফেসখানা লাভেবল! অপূর্ব! জানিস মুকু? এইসব ফেস দেখলে তবেই পৃথিবীটা বাসযোগ্য মনে হয় মাঝেমাঝে।

সে মেয়েদের ভিড়টার দিকে এমন করে তাকিয়ে আছে দেখে চিমটি কেটে বললাম, কী হচ্ছে? এটা গ্রাম।

রমেন চটে গিয়ে বলল, তুই মাইরি একটা বুদ্ধু। এইসব দেখব-টেখব না তো কী করে এঁদো গ্রামে পড়ে থাকব বল তো? দম আটকে মারা পড়ব না? তারপর সে ফিক করে দুর্লভ হাসিটি হাসল। সুন্দরী মেয়েরা একেকটি বদ্ধঘরের জানালা। বুঝলি তো? যেমন শ্রীমতী চিমনি তোর জানালা। তাই দিব্যি হাসিমুখে কাটাচ্ছিস। চাষাভুষোর ঘামের গন্ধ টের পাসনে। ছবি শুরু হতে দেরি ছিল। হই হট্টগোলের আড়ালে আমরা দুজনে চাপা গলায় কথা বলছিলাম। হঠাৎ বাঁশ পুঁতে খাটানো পর্দার পেছন থেকে ঝিমি বেরিয়েই রমেনকে দেখে থমকে গেল। ডাকলাম, এস ঝিমি!

হয়তো ঝিমি মিথ্যে করেই বলল, জ্যাঠামশাইকে খুঁজছি। দেখেছেন মুকুলবাবু?

একটু আগে ছিলেন। তুমি বরং প্রজেক্টারের ওখানে গিয়ে দেখ তো!

ঝিমি বলল, আর ভিড় ঠেলতে পারছিনে বাবা!

দেখলাম, রমেন উদাস চোখে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। বললাম, এখানে চলে এস, ঝিমি। টুল বের করে দিচ্ছি। টুলে বসে সিনেমা দেখ। তুমিও তো এসবের একজন উদ্যোক্তা।

ঝিমি ভুরু কুঁচকে বলল, আমি না।

না কেন? তুমি তো অ্যাডাল্ট ফিমেল এডুকেশনের টিচার হয়েছ। অনায়াসে ছড়ি ঘোরাতে পারো।

পারি। বলে ঝিমি নির্বিকার মুখে এগিয়ে এল। তারপর বাঁকা হেসে বলল, দরকার হলে ছড়ি মারতেও পারি।

নিশ্চয় পারো। বলে আমি ঘরে ঢুকলাম টুল আনতে। যেতে যেতে একবার ঘুরে দেখলাম, রমেন তেমনি দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে এবং রিং বানানোর চেষ্টা

করছে। টুলটা যখন নিয়ে আসছি, দেখলাম ঝিমি মুখ টিপে হাসছিল, আমার চোখে চোখ পড়ায় গম্ভীর হয়ে গেল।

টুলে তাকে বসতে বলে পর্দার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ভিড়ের ভেতর দিয়ে ঘুরে প্রজেক্টর যন্ত্রের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে ছবি শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে সব হইহট্টগোলও থেমে গেল।

ছবিটা পুরনো। ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। গানগুলো যেন ভূতের কান্না। তবু জমজমাট স্তব্ধতা। বারোয়ারি বটতলায় পাতা খসে পড়লেও শোনা যেত।

হঠাৎ একটা টান বাজল। বারোয়ারিতলা দিয়ে ভিড়ের ভেতর রাস্তা করে নিয়ে আগাছার জঙ্গলের ধারে পায়ে চলা ফালিপথটার মুখে পৌঁছে গেলাম। জ্যোৎস্না ঝলমল করছে চারিদিকে। হিম ঘনিয়েছে সামান্য। হেমন্তের রাতের এই হিমটা মনোরম। দূরে কুয়াশার নীল ছাপ গাছগাছালির ওপর। নিচের জমি থেকে একটা রাতপাখি ডাকল ঘুমঘুম গলায়।

লক্ষ্য রেখেছিলাম মেয়েদের ভিড়ে চিমনি এসেছে নাকি। তাকে দেখিনি। বিশ্বাস ছিল, সে যদি আসত, তাকে দেখতে পেতাম। আমাকে সে দেখা দিতই।

ঝিমধরা জীর্ণ বাড়ি ঘিরে চাপা স্বরে পোকামাকড় ডাকছিল। হঠাৎ মনে হল, প্রকৃতির খুব ভেতর দিকে চলে এসেছি। এত ভেতরে যে হয়তো দেখব, চিমনি এইসব প্রাকৃতিক জিনিসগুলোর অন্তর্গত হয়ে গেছে। সবুজ শরীর নিয়ে শুয়ে আছে। জ্যোৎস্নার আড়ালে আরামদায়ক হিমে তার সেই সবুজ শরীর বড় স্যাঁতসেঁতে।

অদ্ভুত এই অনুভূতিটা আমাকে থমকে দিচ্ছিল। তারপর শেষ শিউলির করুণ গন্ধ এসে আমার সামনে দাঁড়াল। ভয়, উত্তেজনা, দ্বিধা সবই হারিয়ে গেল। ইটের স্তূপে গজিয়ে ওঠা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে দেখি, খোলা বারান্দায় নিবুনিবু লণ্ঠন এবং দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিমনি।

টের পেয়ে শক্ত গলায় বলল, কে?

আমি। মুকুল।

চিমনি ব্যস্ত হয়ে উঠল। আসুন, আসুন। আজ আপনার সেন্টারে সিনেমা হচ্ছে, না?

হ্যাঁ। তুমি যাওনি কেন?

যাইনি! আপনি ভেতরে আসুন, বরং। হিম লাগবে।

বারান্দায় উঠে বললাম, বলেছিলাম আসব। আসতে পারছিলাম না। আজ

জোর করে—

চিমনি লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে ঘরে ঢুকেছিল। সে ডাকল, বাবা! বাবা! এ্যাডাল্ট সেন্টারের মাস্টারমশাই এসেছেন।

বসন্তবাবু আছেন তাহলে। আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল—ক্লান্তিতেই হয়তো। উত্তেজনার পর এই ক্লান্তি স্বাভাবিক ছিল। কিংবা বসন্তবাবু আছেন জেনেই। মনে হল, বড় অসময়ে এসেছি। সেই তো এলাম, কিন্তু এসে কিছুই ঘটবার সুযোগ আর নেই।

চিমনি বলল, ভেতরে আসুন মুকুলদা!

ঘরে ঢুকে দেখলাম, তক্তাপোষে হেলান দিয়ে বসে আছেন বসন্তবাবু। তাহলে পাগলামিটা আবার সেরে গিয়ে সুস্থ হয়েছেন। চিমনি একটা মোড়া দিল বসতে। বসন্তবাবুকে নমস্কার করে বসলাম। বসন্তবাবু রুগ্ন কণ্ঠস্বরে বললেন, আপনাকে দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে। ভীষণ চেনাও লাগছে।

চিমনি আমার দিকে ঘুরে বলল, পরশু থেকে বাড়িতে আছেন। এখন একেবারে নর্মাল। আবার কিছুদিন পরে হয়তো—বলে সে থেমে গেল।

বসন্তবাবু বললেন, হাঁসুদার খবর কী? অনেকদিন দেখা-টেখা হয়নি। আগে আসতেন খোঁজখবর নিতে। আর আসেন না। শুনেছিলাম অ্যাডাল্ট এডুকেশান নিয়ে মেতে উঠেছেন। ওঁর চিরকাল ওই পাগলামি।

বসন্তবাবু কষ্ট করে হাসলেন। বললাম, আপনার শরীর কেমন বলুন?

ভাল না। এই দেখছেন, হাত পা সব থবথর করে কাঁপছে। চিমনি খাইয়ে দিলে তবে খেতে পারছি। বসন্তবাবু শীর্ণ হাত দুটো তুলে কাঁপুনি দেখালেন। তারপর ফের বললেন, কথা বলতেও কষ্ট হয়।

থাক, তাহলে আর কথা বলবেন না।

তা কি হয়? আপনি আমাদের গেস্ট? পর্ণকুটিরে এসেছেন। দুটো কথা না বললে চলে?

চিমনি দরজার কপাটে হেলান দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ঘুরে বলল, চা খাবেন তো?

বললাম, অসুবিধে না থাকলে—

বসন্তবাবু বললেন, না, না! অসুবিধে কী? চিমনি, ভাল কর চা করে দাও মা! গরিবের ঘরে গেস্ট! চা ছাড়া আর কী দেব?

চিমনি বারান্দায় চা করতে গেল। বললাম, আপনি তো কলকাতায় থাকতেন?

হ্যাঁ। সে বড় দুঃখের হিসট্রি। তবে ভালই ছিলাম। মানে দুমুঠো খেয়েপরে চলে যাচ্ছিল আর কী! হঠাৎ চিমনির মা—আসলে চিমনির অপজিট ছিল। একটুতেই রাগ, লণ্ডভণ্ড, চেঁচামেচি। তবে ভাবতে পারিনি। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি একটু হয়েই থাকে। হঠাৎ যে সামান্য কথাতেই অমন করে বসবে, ভাবতে পারিনি। চিমনি স্কুলে ছিল। আমি অফিসে। খবর পেয়ে দৌড়ে গেলাম। যেতে যেতে ততক্ষণে শেষ। ঘরে প্রচণ্ড আরশোলা আর ইঁদুরের উপদ্রব ছিল। খানিকটা গ্যামাক্সিন এনে রেখেছিলাম। ব্যস, ওতেই—তবে আমার কী? স্ক্যাণ্ডাল যা হবার তোমার নামে হবে। কী বলেন স্যার?

চিমনি এসে দুধের পাত্রটা নিয়ে গেল। ভেবেছিলাম বাবাকে বাধা দেবে। দিল না।

বসন্তবাবু একটু হাসলেন…। মুখ দেখে লোক চেনা যায়। আপনাকে দেখামাত্র মনে হল কত যেন আপনজন। ফ্যামিলির প্রাইভেট স্ক্যাণ্ডাল—তবে বলতে ভাল লাগল।

না, না। স্ক্যাণ্ডাল কেন হবে?

বসন্তবাবু থুতনি খামচে ধরলেন। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, গোঁফদাড়ি পরিষ্কার কামানো। কিন্তু পুরো স্বাভাবিক হয়েছেন কিনা সন্দেহ হচ্ছিল। দুর্বল শরীরে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। অথচ কথা বলছেন এবং কথার সুরে তাল কেটে যাচ্ছে বারবার। তারপর গুম হয়ে চোখ বড় করে থুতনি খামচে ধরে বিছানার দিকে তাকিয়ে আছেন তো আছেনই।

• চিমনি আমাকে সেদিনকার মতো সুন্দর কাপপ্লেটে চা দিয়ে ওর বাবার সামনে গেল। বলল, চা নাও।

বসন্তবাবুর সাড়া পাওয়া গেল না। আবার চায়ের কথা বলে সে কাপপ্লেট ওঁর পাশে রেখে দিল। বললাম, তুমি খাবে না?

চিমনি শুধু মাথাটা নাড়ল।

ব্লক অফিসে কিসের ট্রেনিংয়ের জন্য চেষ্টা করছ, কুন্তলা?

বসন্তবাবু নড়ে বসলেন। আমার দিকে একবার তাকিয়ে চায়ের কাপপ্লেট তুলে নিলেন। চিমনি বলল, মহিলাদের সোশ্যাল এডুকেশান আর ওয়েলফেয়ার সার্ভিসের কোর্স আছে ছ'মাসের জন্য। বি ডি ও নাম পাঠালে হবে।

কোথায় ট্রেনিং?

কল্যাণীতে। তারপর চাকরির একটা চান্স আছে। চিমনি এতক্ষণে একটু হাসল। শেষে গ্রামেই ঠেলবে।

ভালই তো। কী বলছেন বিডিও ?

দেরি আছে। আগামী মার্চে সেসন শুরু হবে। বলছেন নাম পাঠাব। তবে টাফ কমপিটিশান।

তুমি হাঁসুবাবুকে বললে পারতে। ওঁর সঙ্গে বিডিওর খাতির আছে।

হাঁসুজ্যাঠাই তো এর খোঁজ দিয়েছিলেন।

তাহলে হয়ে যাবে।

বসন্তবাবু চুপচাপ খাচ্ছিলেন। চোখদুটো সেইরকম ঠেলে বেরুনো। কাপপ্লেট রেখে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বললেন, আমাকে বাইরে নিয়ে যা। পেচ্ছাপ পেয়েছে।

চিমনি বাবার হাত ধরে বিছানা থেকে ওঠাল। আমি সাহায্য করতে গেলাম বারণ করল। বসন্তবাবু পা ফেলতে পারছিলেন না। চিমনি ওঁকে দুহাতে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো করে বাইরে নিয়ে গেল। উঠোনের কোণায় ছায়ায় বসিয়ে দিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। আজ রাতে জ্যোৎস্না যেন ফেটে পড়েছে। সেই জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে সে এলিয়ে পড়া খোঁপাটা বাঁধতে থাকল। ডাকলাম, কুন্তলা !

উঁ !

তোমার বাবার শরীর হঠাৎ দেখছি একেবারে ভেঙে পড়েছে। ওঁকে বরং হাসপাতালে দিয়ে এলে—

চিমনি আস্তে বলল, দুদিন আগে বাবাকে কারা খুব মারধর করেছিল। হাটবার ছিল সেদিন। বাজারে কার সঙ্গে পাগলামি করেছিলেন। লোকাল লোকেরা চিনতে পেরে বাধা দিয়েছিল। নয় তো মেরেই ফেলত।

সে কী ! পাগল মানুষকে মারল ?

চিমনি তেমনি আস্তে বলল, খবর পেয়ে রিকশো করে নিয়ে এলাম। মনে হচ্ছে, মারধর খেয়ে একটু নর্মাল হয়েছেন।

চলো না, কাল ওঁকে বহরমপুর হাসপাতালে নিয়ে যাই।

ওখানে মেন্টাল ওয়ার্ড নেই। খোঁজ নিয়েছি। জেনারেল ওয়ার্ডে নেবে না। কেসহিস্ট্রি না বললে হয়তো নিত।

বসন্তবাবু ডাকছিলেন। আবার তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে বিছানায় রাখল চিমনি। ওর গায়ের জোর দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মনে পড়ে গেল ও কলকাতার স্কুলে পড়ার সময় নাকি খেলাধুলো করত।

বসন্তবাবু এবার শুয়ে পড়লেন। কাত হয়ে আমার দিকে ঘুরে একটু হাসলেন। বললেন, আমাদের চিরদিন প্ল্যাটফর্মের লাইফ।

কেন বললেন, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু একটু পরে মনে হল, ওঁর ওই কথাটা বলার সঙ্গে এই জীর্ণ ফাটলধরা ঘর, পড়ো-পড়ো ছাদ, তার ভেতর ঝকঝকে নাগরিক আসবাবপত্র—তা যত সামান্যই হোক, আরোপিত লাগে এ পরিবেশে, এসবের গভীর একটা মিল আছে। আগাছার জঙ্গল অথবা বটগাছের ছায়ায় চিমনিকে দেখে কি মনে হয়নি আমার, সে এখানে বাইরের মানুষ ? যদিও সে বলেছিল, আসলে আমি এ গ্রামেরই মেয়ে—কারণ এ গ্রামেই জন্মেছিলাম, ছোটবেলাটা এখানেই কেটেছে, তবু তার চলাফেরা হাবভাবের মধ্যে অনেক নতুনত্ব ঝকমকিয়ে উঠতে দেখেছি, যা নগরের।

অথচ যখনই তার কথা ভাবি, তাকে প্রকৃতির খুব আদিম সত্তার কাছাকাছি করে ভাবি। কাজলি গ্রামের কমলা ডোমনির সঙ্গেও কোথাও যেন আশ্চর্য মিল।

হয়তো আমারই কোথাও গুরুতর ভুল হচ্ছে। অথবা হয়তো এই দুটি নারীকে বহতা প্রাকৃতিক স্বাধীনতার পাড়ে নগ্ন শরীরে এলোচুলে দাঁড়িয়ে থাকা দেখতে পেয়েছি অবচেতন দৃষ্টিপাতে। কোথাও যেন ওরা বৃষ্টির মতো অনর্গল, বৃক্ষলতার মতো অকৃত্রিম, ঋতুচক্রের মতো নিয়মিত। কোথায় বুঝি ওরা প্রকৃতির ছন্দে আটকে আছে।

বসন্তোবাবু বললেন, মাথায় বড্ড ব্যথা। তখন চিমনি তার পাশে গিয়ে বসল। মাথা টিপে দিতে থাকল।

বললাম, মাথাছাড়ানো ট্যাবলেট নেই ঘরে ?

চিমনি বলল, খাবেন না। অ্যালার্জি হয়।

আমি চলি, কুন্তলা।

চিমনি বলল, যাবেন ? আচ্ছা।

বসন্তবাবু ওর শরীরের আড়াল থেকে রুগ্ন কণ্ঠস্বরে বললেন, আবার আসবেন স্যার ? অবারিত দ্বার। আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগল, জানেন ? পাঁচুগোপালের সেই বোনপো ছিল, কী নাম রে চিমনি, অজিত না অমল—ঠিক তার মতো দেখতে। না রে চিমনি ? একেবারে সেই। বড় ভাল ছেলে ছিল ! আহা, বড় ভাল।...

বিড় বিড় করতে থাকলেন বসন্তবাবু ? জিগ্যেস করলাম, কে পাঁচুগোপাল ? নামটা চিমনি চোখ টিপলে থেমে গেলাম।

বসন্তবাবু ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করার মতো কথা বলছিলেন। বেরিয়ে গিয়ে হু হু করে বয়ে যাওয়া জ্যোৎস্নাস্রোতে পড়তেই মনে হল ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি।

অনেক অভিমান নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেলাম। নিচের জলা জমিতে আবার রাতপাখিটা ডাকল। কুন্তলা তো বলল না আবার আসবেন!

ছবি তখনও শেষ হয়নি। সেন্টারের দরজার পাশে টুলে একা বসে আছে রমেন। ঝিমিকে দেখতে পেলাম না। আমাকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল। মুখে দুর্লভ হাসিটা আবার দেখতে পাচ্ছিলাম। চাপা গলায় বলল, ভেতরে চল। জরুরি কথা আছে।

গতকাল নতুন তক্তাপোষ বানিয়ে দিয়েছে ভাঁটুমিস্ত্রি। যোগী ডোমের ভয়টা চলে যাওয়ায় ওদিকের জানালার ধারে বিছানা পেতেছি। ওদিকটা দক্ষিণ। জানালা দিয়ে একরাশ জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বিছানায়। রমেন উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বলল, এখনও আমার বুক কাঁপছে এই দ্যাখ!

সে তার বুকে আমার একটা হাত চেপে ধরল। বললাম আবার চড় খেয়েছিস তো ঝিমির?

রমেন খি খি করে হেসে বলল, সে কী! তুই কেমন করে জানলি?

জানি। দ্বিতীয় চড়ের বিবরণ দে, শুনি!

না, না। রমেন শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল।—তখন তুই চলে গেলি। আমি তো ওকে ডোন্টকেয়ার করে দাঁড়িয়ে আছি আর ও টুলে বসে ছবি দেখছে। বোগাস ছবি। আমি এই ঘরে চলে এলাম। ঠিক এইখানে বসে আছি, বুঝলি? কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি ঝিমি ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমি একেবারে সাইলেন্ট! শালা! কত মেয়ে দেখলাম, তোমাকে দেখছি এ পুঁইতলায়, চুপ করে বসে আছি—একদমচুপ।

আহা, কী হল তাই বল্।

শোন না। কিছুক্ষণ পরে বলল, রমেনদা, আপনি রাগ করেছেন আমার ওপর? বলেই কাছে এসে আমার একটা হাত নিয়ে নিজের গালে মারতে শুরু করল। আর কান্না! আমি পাপ করেছি, আমার হাত খসে যাবে। এই বলে কী কান্না। থামানো যায় না মাইরি!

বলিস কী!

রমেন ফের খি খি করে হেসে বলল, আমার তখন হয়েছে বিপদ। সবাই ছবি দেখতে মত্ত। তবু বলা যায় না, যদি বাই চান্স কেউ এসে পড়ে, কী কেলেঙ্কারি হবে বল? তুই এসে পড়লে ভয় নেই। কিন্তু যদি ধর, ওর জ্যাঠামশাই এসে পড়েন?

তুই কী করলি তাই বল্!

আদর-টাদর করলাম। মেয়েরা এসব সময় যা ভায়োলেন্ট হয়ে যায়, ভাবা যায় না। তাছাড়া ঝিমিটা বড্ড এমোশানাল তো! আর্টিস্ট মন! এমোশানাল হবেই। ক্ষমাটমা চেয়ে একাকার!

শুধু আদরই করলি। আর কিছু?

কী যে বলিস! জাস্ট্ এক মিনিটের ব্যাপার! তুলকালাম করে দিয়ে চলে গেল। আমার বুকে মাইরি এখনও এক্সপ্রেস ট্রেন চলছে। কী ডেঞ্জারাস গেম, ভেবে দ্যাখ মুকু!

বাইরে হইহট্টগোল শুরু হল। ছবি শেষ হয়েছে। রমেন বলল, চলি রে! কাল দেখা হবে।

সে চলে গেলে হঠাৎ সেই ব্যর্থতার বোধটা আমাকে ধাক্কা মারল। তীব্র অভিমান বুকের ভেতর চেপে বসল। জ্যোৎস্নার দিকে শূন্যদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম।

তারপর মনে হল, আমিও কি কুন্তলাব কাছে এমন কিছু আশা
আমিও কি রমেনের মতো কুন্তলার চোখের জল বুকের জামায় নিতে পারলে এবং ওর চুলে মুখ ডুবিয়ে শিউলির ঘ্রাণ নিতে পেলে সুখী ভাবতাম নিজেকে?

না, না। এমন কিছু কদাচ নয়। জ্যোৎস্নার রাতে হিম শিশিরে ভেজা জঙ্গলের পথে এটুকু পাবার আশায় আমি কখনও হেঁটে যাইনি। আমি চেয়েছিলাম আরও বড়ো কিছু, গভীরতর কিছু, যা প্রকৃতির খুব ভিতরদিকে থরেবিথরে সাজানো আছে—মানবিক হয়েও যা অলৌকিক, যা একটি পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং আমরা দুজনেই পরস্পরের কাছে প্রাকৃতিক নিয়মে অঙ্গীকৃত। মানুষের ভাষায় এই বোধকে হয়তো ধরা যায় না।...

নকুল এসে ডাকল, আসুন মাস্টোমশাই! খাবেন চলুন।

খেতে কিছু ইচ্ছে করছে না, নকুল।

মাথাখারাপ? আজ বেরৎ ভোজ। নকুল বলল। টকিবাবুরা খাবেন। তালগুড়বাবু খাবেন। গেরাম সেবকবাবু খাবেন। সল্লা ঠাকরুন বিকেলবেলা থেকে রেঁধে সারা। বেচারি টকিবাজি দেখতে পেলে কি না কে জানে। আসুন আসুন।

নকুলের তাড়ায় উঠতেই হল।

দিনশেষে আজকাল ছমছমে ঈষৎ হিম শরীর স্পর্শ করে চুপিচুপি, শেষ রাতে চাদর চাপাতে হয়। ভোরে কুয়াশা জড়িয়ে থাকে গাছপালায়। গ্রামের পথে

হলুদ ধানের পাতা আর ছেঁড়া শীষ পড়ে পড়ে থাকে। আনাচেকানাচে 'কাত্‌কে' ধান লাগানো হয়েছিল। কাটা শুরু হয়েছে। আগাছার জঙ্গলের নিচের জমিটা থেকে ধান উঠে গেছে। কালো হয়ে পড়ে আছে শূন্য ক্ষেত। সাদা বক বসে থাকে চুপচাপ। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবি চিমনিদের বাড়ি যাব নাকি ? যেতে বাধে। ফিরে আসি রাস্তায়। বাজারের দিকে হাঁটতে থাকি। রমেনের বাসায় আড্ডা দিই। কিছু ভাল লাগে না। সেন্টারেও ছাত্রদের ভিড়টা একেবারে কমে গেছে। কিন্তু হংসধ্বজের বাড়িতে ভেতরের বারান্দায় মেয়ে ছাত্রদের বেশ ভিড় হয়। নতুন একটা উত্তেজনা হয়তো। নানা বয়সী মেয়ে সব। অনেকের কোলে বাচ্চা। সুর ধরে চেঁচায়, 'অয়ে অজগর আসছে তেড়ে ! আমটি আমি খাব পেড়ে।' তারপর অ আ! অ আ। ঝিমি চেয়ারে বসে থাকে গম্ভীর মুখে হাতে চক। নকুল এসে বলে যায়, বাবুমশাই ইটা কী কল্লেন বলুন তো মাস্টোমশাই ? বুঝবে ঠ্যালা শেযে।

কী ঠ্যালা, নকুল।

মেয়েগুলান সব চুন্নি। কাল থেকে দুটো বাটি খুঁজে পাচ্ছি না। আগের দিন দেখি বস্তায় মাপ করে রাখা চালের মধ্যিখানটা খাল। বাবুমশাইকে বললাম তো মারতে এল। বলে কী, বাটি দুটো খিড়কির পুকুরে খুঁজে দ্যাখ গে। কিন্তু চাল ? দড়ির বাঁধন পর্যন্ত উল্টো। ব্যাপারটা বুঝলেন ? মেয়েরা উল্টোদিকে বাঁধন দেয় না ? বাবুমশাই গেরাহ্যি করলেন না। বাবুদিদিকে বললাম। ঠোঁট উল্টে বলল, আমার কী ? তা তো বটেই। তুমি তো সুখের পায়রা। সুখে খাচ্ছ, গানবাজনা করছ। তালগুড়বাবু গুড়গুড় করে তবলা বাজাচ্ছে। ভালই।

নকুল এসব কথা চুপিচুপি বলে যায়। ভাঁটুর মতে : এই যে সব পড়তে আসছে, সেটা ডেরাইডোলের লোভে। ডেরাইডোলের ব্যবস্থা করেছে গেরামসেবক। বন্ধ হলেই আর কেউ আসবে না। তবে যতটকু পারে, পেটে ঢুকিয়ে নিক। অবলা জীব সব। বিদ্যের ছোঁয়া লাগলেই কানা চোখ খুলে যাবে।

একদিন ভাঁটু এসে বলল, কী কাণ্ড ! ডাকিনী কমলা কী করেছে দেখে আসুন গে।

কী করেছে সে ?

ভাঁটু হাসতে লাগল। বলল, সে তো অ্যাদ্দিন মায়ের বাড়ি রুকুনপুরে গিয়েছিল শুনেছিলাম। আজ হঠাৎ বাজারে গিয়ে দেখি, চট বিছিয়ে বসে আছে হাইরোডের ধারে। ওষুধ বেচছে। কপালে লাল ফোঁটা। সিঁথে ভর্তি সিঁদুরের কী ঘটা ! নানা রকম ট্যাড়বাঁকা উদ্ভুটে সাইজের জড়িবুটি। তা'পরে আপনার গে

ভালুখের নোখ, সাপের হাড়, প্যাঁচার ঠোঁট, মড়ার খুলি—উরে ব্বাস ! চাউনি দেখলেই ভয় করে। জিজ্ঞাসা করলাম—খপর কী, যেন চিনতেই পারলে না। ভাঁটু রেগে গেল বলতে বলতে। বললাম, হাড়িকাঠ থেকে তোকে বাঁচিয়েছিল তোর কোন বাবা ? অ্যাঁ, তাও গেরাহ্যি নেই। যখন চলে আসছি, তখন বলে কী, ও। তুমি সেই কাঠমিস্তিরি ! নেমকহারাম !

যোগীর খবর কী জানো ?

সে যা তার কাজ, তাই করে বেড়াচ্ছে শুনেছি। ভূত ছাড়ানোর পেশা। ভূত ছাড়াচ্ছে গাঁয়ে-গাঁয়ে।

কমলা থাকে কোথায় !

পানবিড়ির দোকান আছে—ওই যে গো, নুরু স্যাক নাম। তার দোকানের লাগোয়া একটা খুপরি আছে, সেখানে। মনে হল, নুরুর সঙ্গে একটা 'নটা-ঘটা' হয়েছে। নৈলে জায়গাথল দেবে ক্যানে ?

নটা-ঘটা জিনিসটা কী, ভাঁটু ?

ভাঁটু খিক করে হাসল শুধু। শেষে বলল, আইন বলুন, ভালমানুষি বলুন, সবই গাঁয়ের ভেতর। গাঁয়ের বাইরে কী হচ্ছে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। হাইরোডের বাজারে ওসব জিনিস নেইকো। আপনি চোখ বুজে দিনকে রাত করতে পারেন, রাতকে দিন। ক্যানে জানেন তো ?

না। কেন ?

বাজার হলগে ছত্তিশ জেতের জায়গা। বাইরের লোকই বেশি। কে কাকে ডরায় ?

আজকাল দিনের দিকেও কেউ পড়তে আসে না। সন্ধ্যার অনেক পরে বড়জোর জনা পাঁচ-ছয়। কোন রাতে শুধু ভাঁটু, নকুল আর ভানুধর। ভানুধরের বাড়িটা পাশে বলেই সে আসে। এসে শুধু ঝিমোয়।

কিন্তু হংসধ্বজের বাড়ির দিক থেকে মেয়েদের সুরেলা গলার চিৎকার ভেসে আসে। নকুল কান করে শুনে বলে, ওই চেঁচাচ্ছে তো ? এই ফাঁকে কিন্তু কাজটিও সেরে নিচ্ছে। বস্তা ফাঁক করে দিচ্ছে, নয়তো চায়ের কাপটাপ যা পায়। কথায় বলে, চোরের কপনি লাভ !' বাবুমশাইয়ের হুঁশ হল না গো।

হাটবারে বাজারে গিয়ে একদিন কমলাকে দেখলাম। তাকে ঘিরে ঘন ভিড়। উঁকি মেরে দেখি, ভাঁটু যা বলেছিল তাই বটে ! চোখে চোখ পড়তেই একটু হাসল। ভাল আছেন মাস্টোমশাই ?

মনটা ভরে গেল এইটুকুতেই। কালীদহের ধারে এক বিপদের রাতে এই

ডাকিনীর মানবী চেহারা দেখে অবাক হয়েছিলাম। এ মুহূর্তে তার হাসি আর ওই কথাটা জানিয়ে দিল, সেই মানবী বেঁচে আছে তার মধ্যে। জঘন্য নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেও সরলভাবে বেঁচে আছে তার মানবী সত্তা।

বললাম, তুমি দেখছি এই কারবারে নেমেছ। কমলা আস্তে বলল, পোড়া পেট, মাস্টোমশাই! কী করব?

বলে সে সুর ধরে তার মন্ত্রপূত ওষুধের ব্যাকগ্রাউণ্ড গাইতে লাগল চেরা গলায়.

বলো বলো বলো কন্যে কোথায় পাইলে কড়ি/
একড়ি তো কড়ি নয়কো নাম বিষহরি/
জঙ্গলে-রঙ্গলে পাইলাম/পাইলাম সাগরে।
পর্শ কল্লে মরা বাঁচে বাইত তেপ্পহরে।

কমলা ডাকিনী মূর্তি হয়ে একটা প্রকাণ্ড সামুদ্রিক কড়ি তুলে সামনেকার লোকটার হাত টেনে ধরল। সে বসে ছিল মুগ্ধভাবে। বড় বড় দাঁত খুলে হেসে বলল, ভারি ঠাণ্ডা আর মোলাম তো!

একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম। পাশেই লাউড স্পিকারে হিন্দি ফিল্মের গান হচ্ছে। আদিম পৃথিবীর বহস্যময় ডাকিনীর কণ্ঠস্বর ঢেকে দিচ্ছে সেই নির্ঘোষ। বাসট্রাক টেম্পো রিকশার সঙ্গে গরুমোষের গাড়ি ওতপ্রোত। কোমরে নেহাৎ একফালি কাপড় জড়ানো মানুষের ভিড়ের ভেতর সিন্থেটিক কাপড়পরা সুশোভিত মানুষজন। এক অদ্ভুত হ য ব র ল।

ফেরার পথে চিমনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার হাতে বাজারের থলে। আমাকে দেখে সেই লজ্জা পাওয়া ভঙ্গীতে মুখটা একটু কাত করে রেখে বলল, বাজারে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। তুমি—

দেখতেই তো পাচ্ছেন। হাটে এসেছিলাম।

তোমার বাবা কেমন আছেন?

ভাল না। আপনি তো আর গেলেন না? বাবা রোজ বলেন আপনার কথা।

চলো, এখনই যাই।

বেশ তো! আসুন!

নির্জন রাস্তায় পৌঁছে বললাম, সেদিন অত রাতে গিয়েছিলাম। জানি না তুমি কী ভেবেছ।

চিমনি আস্তে বলল, কী ভাবব? আমি কিছু ভাবিনি! একটু পরে আবার

বলল, ভাববার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

একটা লোক এসে আমাদের সঙ্গ নিল। দুজনে চুপচাপ হাঁটতে থাকলাম। লোকটা দুজনের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেলে বললাম, এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না, কুন্তলা!

সে কী! কেন!

বয়স্কশিক্ষার আসল সমস্যাটা ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। বয়স্কশিক্ষার ব্যাপারটা হাঁসুবাবুর মতে, ব্যক্তিগত লড়াই। আমি ক্রমশ বুঝতে পারছি, তা নয়—এটা সামাজিক লড়াই। অকারণ এসব করছেন উনি। অনর্থক পরিশ্রম, টাকা খরচ।

চিমনি একটু পরে বলল, হাঁসুজ্যাঠাকে আপনি এখনও চিনতে পারেননি। লোকে যেমন মদ খায়, উনি তেমনি—

কথা কেড়ে বললাম, ঠিক তাই। এবং সেটা অনেক আগেই বুঝেছি।

চিমনি চুপচাপ হাঁটতে থাকল। হংসধ্বজের বাড়ির কাছে আসতেই ঝিমির গান আর তবলার বাজনা শুনে বুঝলাম, রমেন বাজাচ্ছে। গেটের কাছে একটু দাঁড়িয়ে কান করে শুনে চিমনি বলল, কে গাইছে, মুকুলদা?

সে কী? তুমি ঝিমিকে দেখনি? হাঁসুবাবুর মামাতো ভাইয়ের মেয়ে।

ও হ্যাঁ। ওঁর কথা শুনেছি। ফিমেল অ্যাডাল্ট এডুকেশনের টিচার। বেশ গাইছে কিন্তু! তবলা বাজাচ্ছে কে জানো?

চিমনি মাথা নাড়ল। বুঝলাম ইদানীং বাইরের সঙ্গে সম্পর্কটা কমে গেছে তার। রমেনের গল্প করতে করতে আগাছার বনের পথে চিমনিদের বাড়ি পৌঁছুলাম। রমেন ও ঝিমির প্রেম নিয়ে আমি হাসলেও চিমনি হাসল না। তাকে খুব অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। বাড়ি ঢোকার মুখে সে হঠাৎ ঘুরে বলল, সত্যি চলে যাবেন?

ইচ্ছে হল বলি, তুমি যদি বারণ করো, যাব না। কিন্তু বলতে পারলাম না। শুধু বললাম, ভাল লাগছে না।

চিমনি কোনো কথা বলল না। থলেটা বাইরের তাকে রেখে ঘরে ঢুকে ডাকল, বাবা!

ক্ষীণ স্বরে সাড়া এল, চিমনি এলি?

সেন্টারের মুকুলদা এসেছেন তোমাকে দেখতে।

ও! খুব ভাল, খুব ভাল!

ভেতরে ঢুকে দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে সময় লাগল। বাইরে উজ্জ্বল রোদ! দেখলাম,

বসন্তবাবুর শরীর আরও শীর্ণ হয়ে গেছে। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। চোখদুটো কোটরাগত। জ্যান্ত মরা দেখছি যেন। জিগ্যেস করলাম, কেমন আছেন এখন ?

বসন্তবাবু হাসবার চেষ্টা করলেন। ওবেলা খবর পাবেন, নেই।

না, না। আপনি ভাল হয়ে যাবেন। চিমনি মোড়াটা দিলে বসলাম। তারপর চিমনিকে বললাম, ওঁকে কোনো ওষুধপত্র খাওয়াচ্ছ না, কুন্তলা ?

অ্যালোপাথিক ওষুধে অ্যালার্জি হয়। চিমনি বলল। শেষে কবরেজি ওষুধ এনে খাওয়াচ্ছি।

কোনো ইমপ্রুভমেন্ট তো দেখছি না। তুমি হাঁসুবাবুর হোমিওপ্যাথিক এনে খাওয়ালে পারতে।

হাঁসুজ্যাঠা তো ডাক্তার নন। সখের ট্রিটমেন্ট করেন।

চিমনি বেরিয়ে গেল সম্ভবত চা করতে। বসন্তবাবু বড়োচোখে আমাকে দেখছিলেন। হঠাৎ ফিসফিস করে ডাকলেন, বসন্ত ! ও বসন্ত ! একটা কথা শুনে যা। কাছে আয় না। কাছে আয়, বলছি।

এ তো আবার পাগলামি দেখছি ! চিমনিকে ডাকলাম দ্রুত। সে বাইরে থেকে বলল, কী হল মুকুলদা ?

বেরিয়ে গিয়ে বললাম, ওঁর তো আবার সেইরকম হয়েছে। আমাকে হঠাৎ বসন্ত বসন্ত বলে ডাকছেন।

চিমনি শ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ। হঠাৎ এটা হচ্ছে। একটু পরে আবার নর্মাল।

বসন্তবাবু ভেতর থেকে রুগ্ন স্বরে বসন্তকে ডাকাডাকি করছেন তখনও। চাপা গলায় বললাম। আচ্ছা কুন্তলা, উনি নিজেকে পাঁচুগোপাল মিত্তির বলেন শুনেছি। কে তিনি ?

চিমনির মুখটা হঠাৎ যেন শাদা হয়ে গেল। একটু পরে মুখ নামিয়ে বলল, বাবার এক বন্ধু। আমি তাঁকে দেখিনি।

তুমি কি আমার জন্য চা করছ ?

খাবেন না ?

ইচ্ছে করছে না। একটু পরে আবার বললাম, আমার কিছু ভাল লাগছে না, কুন্তলা !

চিমনি খুব আস্তে বলল, কেন ?

জানি না।

চিমনি কেটলি নামিয়ে রাখল কেরোসিন কুকার থেকে। খোলা বারান্দার ওই

অংশটুকুতে খড় চাপিয়ে কিচেনমতো করা হয়েছে। কালো হয়ে গেছে চালটা। সে কয়লার উনুন সাজাতে থাকল। একটু ইতস্তত করে বললাম, আমি যাই, কুন্তলা!

চিমনি কাজ করতে করতে বলল, বাবাকে বলে যান।

দরজার কাছে গিয়ে বললাম, কাকাবাবু, আমি যাচ্ছি।

বসন্তবাবু বিড়বিড় করছিলেন। জবাব দিলেন না। মনে হল 'বসন্তের' সঙ্গে কথা বলছেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ঝাঁকড়া শ্যাওড়া গাছের তলায় ছোট্ট নালা ডিঙিয়ে আগাছার বনের পথে ঢুকেছি, চিমনির ডাক শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। চিমনি নালাটার ওধারে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি কি সত্যি চলে যাবেন ভাবছেন?

সত্যি।

কথা দিন, যাবার আগে দেখা করে যাবেন।

কেন?

চিমনির নাসারন্ধ্র ফুলে উঠল। মুখটা হিংস্র দেখাল। শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো গলায় বলল, কেন! আমার কোনো কথা থাকতে পারে না? আমি কি এতই—

একটু হেসে বললাম কথা দিলাম কুন্তলা! দেখা করেই যাব।

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অকারণ একবার ঘুরে দেখি, চিমনি তখনও একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

ইদানীং রাতে একেবারে ঘুম আসে না। জীবনের তুচ্ছ সূক্ষ্ম ব্যাপারটা বিশাল-বিশাল হয়ে খুলির ভেতর জেগে ওঠে আর হুলস্থূল চলতে থাকে। বারবার কুন্তলার কথাটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে : আমার কোনো কথা থাকতে পারে না? আমার কোনো কথা থাকতে পারে না? আমার কোনো কথা থাকতে পারে না?

তারপর চকচকির কাশবনের সবুজ ট্রেনটার কথা মনে পড়ে যায়। কুন্তলাকে তুলে নিয়ে যায় সেই শব্দহীন জনহীন স্বপ্নের ট্রেন। খালি ভাবি কেন এ স্বপ্ন দেখেছিলাম? শেষরাতে জ্যোৎস্নার রঙ শাদা হয়ে যায়। অলীক ভোরের মায়ায় ঘুমভাঙা ধরা গলায় পাখিরা ডেকে ওঠে কুয়াশার ভেতর দিয়ে। তখনই চোখের পাতা বুজে আসে। সেই ঘুম নকুলের ডাকাডাকিতে ভাঙতে একেবারে উজ্জ্বল রোদ্দুর।

নকুল বলল, দুবার চা নিয়ে ডেকে গেছি। কিছুতেই সাড়া পেলাম না। কটা বাজে ঘড়িতে, বলুন তো? কাঁটায় কাঁটায় আটটা। নকুল চা ঢালতে ঢালতে বকাবকি করছিল। শরীল খারাপ হবে না মাস্টোমশাই এত বেলা করে উঠলে? এতক্ষণ পিথিমিতে কত কাণ্ড হয়ে গেল। ইদিকে আপনি ঘুমোচ্ছেন।

কী কাণ্ড হল, নকুল?

নকুল মুখে দুঃখ ফুটিয়ে বলল, পাগলা বসোবাবু মবে গেল।

চমকে উঠলাম। কখন নকুল, কখন?

অনেক রেতে। আম্মো খপব পাইনি। নকুল বলল। একটু আগে বাবুপাড়ায় যেয়ে শুনলাম। ভোরবেলা শ্মশানে দাও-কাজ হয়েছে। এও শুনলাম ভালই পুড়েছে বসোবাবু। কোনো অসুবিধে হয়নি।

নকুল চলে গেলে অবাক হয়ে বসে রইলাম। কুন্তলা আমাকে খবর দিল না।

ভাঁটু মিস্ত্রি এল থপথপিয়ে। মুখটা ভীষণ গম্ভীর। মাস্টোমশাই, খবর শুনেছেন?

শুনেছি। চিমনির বাবা মারা গেছেন।

ভাঁটু মেঝেয় বসে বলল, আমি খপব পাইনি। শেষ রাতে হরিবোল শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু কে জানে চিমনিদিদির বাবা?

আস্তে বললাম, চিমনি আশ্চর্য মেয়ে তো! কাউকে দিয়ে খবর পাঠাল না একটা?

ভাঁটু বলল, লোক পায়নি হয়তো। আর মাস্টোমশাই, খপর পাঠিয়েই বা কী হত? আপনিও বাঁচাতে পারতেন না, আম্মো না। তবে কথা কী, শ্মশানে না হয় যেতাম। আপনিও যেতেন। এর বেশি কিছু তো না!

ভাঁটু উঠে গিয়ে তাক থেকে একটা শ্লেট পেন্সিল নিয়ে এল। আপন মনে কিছু লিখতে থাকল। একটু পরে বললাম, হয়তো আমার যাওয়া উচিত, কী বলো ভাঁটু?

ভাঁটু শ্লেট থেকে মুখ তুলে মাথা নেড়ে বলল, উঁহু—এখন না। আমি গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই আসছি। বাড়ি ভর্তি পাড়াপ্রতিবেশী বসে আছে। মেয়েটাকে শান্ত-সোন্থ করছে। ওই মেয়ে যে অমন কাঁদতে পারে, ভাবিনি মাস্টোমশাই।

আবার কিছুক্ষণ লেখালিখি করে ভাঁটু ফের বলল, পরে বরঞ্চ যাবেন। একটু সামলে উঠুক। এখন লোকে আপনাকে সেখানে দেখলে—বোঝেন তো ঝাঁপুইতলা কী জিনিস। বললেই হল, সেন্টারের মাস্টামশাই ক্যানে? স্বজাতি

নয়কো, কুটুম্ব নয়কো—নেহাত মুখচেনা মানুষ। সে আবার চিমনির কাছে ক্যানে এমন অসময়ে? তাছাড়া ভেবে দেখুন, গিয়ে দেখবেন—যার কাছে গেছেন, দুটো শান্তকথা বলতেই গেছেন, যাওয়া রুচিতও বটে—কিন্তু সে তো শোকে পাথর। মুখ তুলে চাইতেও পারবে না আপনার দিকে। তাই না?

বললাম, হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ, ভাঁটু।

ভাঁটু একটু হাসল।... আসবে। আপনার কাছেই সময়মতো আসবে। বাম্মনভুজ্জন করাতে হবে না? ছাদ্ধশান্তি হবে না? নেমন্তন্ন করতেই আসবে। এট্টু ধৈজ্জ ধরুন।

ভাঁটুর কথা শুনে একটু রাগ হল। কিন্তু চুপ করে থাকলাম।

কিছুক্ষণ পরে রমেন এল। পরনে ছাইরঙা মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি, ধবধবে পাজামা। একেবারে ফিটফাট। ইদানীং আর ওর নাকের ডগায় কুঞ্চন দেখি না। দেখি না তেতোগেলা মুখ। প্রেম সত্যি আশ্চর্য জিনিস। কাউকে কাউকে অলৌকিক ছটায় মহাপুরুষ করে তোলে।

আমাকে দেখতে দেখতে বলল, কী হয়েছে রে? মুখখানা পেঁচার মতো করে আছিস কেন?

কিছু না। তোর খবর কী?

ভাঁটুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে রমেন চোখ টিপল। তারপর বলল, তোর জন্যে সুখবর নিয়ে এলাম। খাইয়ে দিবি। তোর সেন্টারের জন্য অ্যাডহক গ্রান্ট স্যাংশন হয়েছে। তপন বলল, এইমাত্র সকালের ডাকে চিঠি এসেছে। তারপর হাঁসুজ্যাঠামশাইয়ের কাছে চলে এলাম দুজনে। তপনকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে তোর কাছে এলাম। খুব তো ভেবে মরছিলি। এবার।

বাধা দিয়ে বললাম, কিচ্ছু ভাবিনি।

রমেন সিরিয়াস হয়ে বলল, ভাববার কথা। যে চাকরিই হোক, মোটামুটি অন্তত মাসে-মাসে মাইনে পাওয়ার একটা সিওরিটি তো থাকা দরকার। আপাতত অ্যাড-হকগ্র্যান্ট এর পর ধরে নিতে পারিস, রেগুলার গ্র্যান্ট স্যাংশান হতেও পারে। থার্ড প্ল্যানে অ্যাডাল্ট এডুকেশনের জন্য ভাল টাকা বরাদ্দ আছে শুনেছি। কোনো রকমে সেকেণ্ড প্ল্যানের বাকি পিরিয়ড কাটিয়ে দিতে পারলে দেখবি কী হয়। এই মাটির দেয়াল আব থাকবে না। ইটের বিল্ডিং হবে। চিয়ার আপ, মাই ফ্রেণ্ড!

রমেনের হাসি আর দুর্লভ হয়ে নেই। যথেচ্ছ ঝরে আজকাল। সত্যি, প্রেম আশ্চর্য জিনিস। কিছুক্ষণ সে আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবিটা এঁকে হঠাৎ উঠে

দাঁড়াল। আয়। বড্ড হাত সুড়সুড় করছে সকাল থেকে। অবশ্য জানি না, শ্রীমতীর মুডের অবস্থা কী। বড্ড মুডি মাইরি!

বললাম তুই যা রমেন। দেখছিস না, ছাত্র এসে গেছে। আজকাল সবসময় ক্লাস চালাচ্ছি।

রমেন ভাঁটুর দিকে কৌতুকে তাকিয়ে চটি ফটফটিয়ে চলে গেল।

ভাঁটু এতক্ষণ একবারও মুখ তোলে নি। স্লেটটা ভবে দিয়েছে লেখায়। রমেন চলে গেলে মুখ তুলে বলল, তালগুড়বাবুর জাতি কী মাস্টোমশাই?

ভেবো না। কায়েতের ছেলে।

ভাঁটু খি খি করে হাসল। তবে তো হয়েই গেল মশাই!

কী হয়ে গেল ভাঁটু?

ভাঁটু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, অবিশ্যি সেও কপাল। আমাদের হাঁসুবাবু এখন ওনাকে পছন্দ করছেন। হয়তো কাল দেখবেন, ছায়া পর্যন্ত মাড়াচ্ছেন না। খেয়ালি মানুষ বড্ড। এজন্যেই তো গ্রামের বাবুদের সঙ্গে বনে না। বড় মাথা খারাপ, বুঝলেন? বিষম মাথাখারাপ।

তার প্রচণ্ড প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিনই রাত্রে। খেয়েদেয়ে এসে শুয়ে পড়েছিলাম। সকালে রমেনের কথাটা শুনে আবার দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, তাহলে কষ্ট করে থেকেই যাই ঝাঁপুইতলায়। চলে গিয়ে তো আবার টিউশনি খুঁজে বেড়াতে হবে। আবার সেই আশা-নিরাশার টানাপোড়েনে অসহায় পোকামাকড়ের মতো আটকে গিয়ে যন্ত্রণায় ছটফটানি।

তবু তো এখানে কিছু নিশ্চয়তা আছে। আর কুন্তলা—

হ্যাঁ, কুন্তলা আছে। কুন্তলার কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে মনটা ভরে গেল আশ্চর্য এক সুখে।

সেইসময় হংসধ্বজ এসে ডাকছিলেন, ঘুমুলে নাকি—ও মুকুল?

সাড়া দিয়ে দরজা খুলে দিলাম। লণ্ঠনের দম তুলে মশারি খুলে দিয়ে বললাম। বসুন জ্যাঠামশাই!

হংসধ্বজকে ভীষণ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ দাড়িতে হাত বুলিয়ে কেসে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর বললেন, অ্যাড-হক গ্রান্ট স্যাংশন হয়েছে আড়াইশো টাকা।

শুনেছি।

কে বলল? গ্রামসেবক?

না, রমেন।

হংসধ্বজ একটু চুপ করে থেকে বললেন, সরকারি টাকা ছুঁতে ভয় করে। টাকা নেব। তারপর গ্রামের দুমুখরা রটাবে সরকারি টাকায় ফুলের বাগান করেছি। বেনামে চিঠি লিখবে সরকারের কাছে টাকাগুলো নয়ছয় করছি বলে। ঝাঁপুইতলার লোককে তো আমি ভাল জানি। তাই ঠিক করলাম টাকাটা নেব না। ওসব অবলিগেশনের মধ্যে না যাওয়াই ভাল। টাকা নিলে এরপর সরকারি লোক এসে ইন্সপেকশনের নামে তম্বি করবে। ইউটিলাইজেশসন সার্টিফিকেট দেব। তার হাজারটা ত্রুটি খুঁজে বের করবে। খাতাপত্র রাখতে হবে, সেও এক অকারণ ঝামেলা। অনেক ঘা খেয়ে শিখেছি, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, সরকারি লোকে ছুঁলে একশো ঘা।

আবার কিছুক্ষণ দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, তোমাকে আমি নিজে থেকেই ডেকেছিলাম। না-না। তোমার কোনো ত্রুটি নেই। তুমি যথেষ্ট করেছ। কিন্তু ভেবে দেখলাম, এভাবে তোমার জীবনটা নষ্ট করার অর্থ হয় না। চাকরির এজ পেরিয়ে যাবে, তারপর সমস্যায় পড়বে। এদিকে সেন্টারের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ। ধানকাটা মরশুমে একেবারে ফাঁকা পড়ে থাকছে। আবার সেই মাঘ-ফাল্গুনে তখন ছাত্র পাওয়া যাবে। তাই ভাবছিলাম, কী করা যায়। শেষে ঠিক করলাম, ঝিমি তো আছে। ঝিমিকে দিয়ে চালিয়ে নিলে মন্দ হয় না। চটপটে বুদ্ধিমতী মেয়ে। পড়াচ্ছেও চমৎকার। তার চেয়ে বড় কথা, তাকে মাইনে দিতে হবে না। কিন্তু তোমার অবশ্যই টাকা দরকার। তোমার প্রয়োজন অনেক বেশি। ঝিমি মেয়ে। তার বিয়ে দিলেই সমস্যার শেষ। কিন্তু তুমি ছেলে। তোমার ভবিষ্যৎ আছে। জীবনকে ফুলেফলে ভরিয়ে তোলার সম্ভাবনা আছে। এখানে পড়ে থেকে তা নষ্ট করার মানে হয় না।

আস্তে বললাম, আমি চলে যাব ঠিক করেছিলাম।

হংসধ্বজ আমার হাত চেপে ধরলেন। না, না। ওভাবে বলো না। আমার বুকে বাজবে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, মুকুল।

ছি, ছি। এ কী বলছেন জ্যাঠামশাই। হংসধ্বজের পা ছুঁয়ে কপালে হাত ঠেকালাম।

হংসধ্বজ সেদিনকার মতো চোখের কোণা মুছে ধরা গলায় বললেন, কালকের দিনটা থাকো। দুমাস এসেছ—ভাল করে খাওয়াতে পারিনি। কাল খিড়কির পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরাব। নিজে হাতে রান্না করে তোমাকে খাওয়াব। আর—পকেট থেকে কিছু নোট বের করে আমায় হাতে গুঁজে দিলেন। তোমার এমাসের মাইনেটা। আরও কিছু বেশি দেবার ইচ্ছে ছিল। হয়ে

উঠল না।

হংসধ্বজ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঠোঁট ফাঁক করলেন আবার কিছু বলবেন বলে। বললেন না। বেরিয়ে গেলেন।

টাকাগুলো মুঠোয় চেপে আমি বসে রইলাম। আমার শরীর কাঁপছিল। এতটুকু জোরও যেন নেই শরীরে। বুকের ভেতর কী একটা ঠেলে উঠছিল। কতদিন ধরে চলে যাব, চলে যাব ভেবে এসেছি। কিন্তু দেখছি, চলে যাওয়াটা মোটেও সহজ ছিল না। সত্যি করে যখন চলে যাবার হুকুম জারি হল, তখন আমার ওপর বজ্রপাত। রাগে দুঃখে ক্ষোভে বুক ভেঙে যাচ্ছে। সত্যি চলে যেতে হবে? বিশ্বাস করতে পারছি না। ঝাঁপুইতলার জীবনযাপনের প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দের চিত্রকলা হয়ে ভেসে আসছে। মানুষজন, গাছপালা, মাঠ-ঘাট, নদী, কাশের বন, বিকেলে বাজারের ভিড়ে হেঁটে জগনের দোকানে চা খাওয়া, হাইওয়ের শেষপ্রান্তে সূর্যাস্ত, ভাঁটু মিস্ত্রি, আর চিমনি—কুন্তলা। প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর ঘ্রাণ বুকে নিয়ে ডাকিনী কমলা ডোমনি! এখনও নদীর ধারে সেই প্রতিধ্বনি বসন্তো। বসন্তো-ও। বসন্তো-ও-ও!

বাইরে এ রাতে অসম্ভব জ্যোৎস্নার ঝড়। শব্দহীন সেই ঝড়ের ভেতর ঝাঁপুইতলাকে রহস্যময় দেখাচ্ছিল। বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কিছুক্ষণ পরে টের পেলাম, নিশির ডাকে আচ্ছন্ন মানুষের মতো আগাছার বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছি। বাঁদিকে শসাশূন্য জলাজমিতে রাতপাখিটা ঘুমঘুম স্বরে ডেকে উঠল। সামনে কুয়াশার ভেতর কুন্তলাদের বাড়িটা হারিয়ে আছে। শ্যাওড়াতলার ছোট্ট নালাটা পেরিয়ে গিয়ে চোখে পড়ল, খোলা বারান্দায় একটা নিবুনিবু পিদিম জ্বলছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পিদিমটা নিভে গেল দপদপ করতে করতে। দরজা বন্ধ। ডাকতে গিয়ে চুপ করলাম। হঠাৎ মনে হল, কেন—কী লাভ? কথা দিয়েছিলাম বলে? পৃথিবীতে কে কথা দিয়ে কথা রাখে?

আস্তে আস্তে ফিরে এলাম। হেমন্তের হিমে আর কুয়াশায় আর জ্যোৎস্নায় নিঝুম ঝাঁপুইতলা আমার পর হয়ে গেল। ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে দরজায় শেকল তুলে দিলাম।

রমেন ঘুম থেকে জেগে খুব অবাক হয়ে গেল। বললাম, কৈ সর তো। একটু জায়গা দে। শুই।

ওপাশের তক্তাপোষে গ্রামসেবক তপনের নাক ডাকছে। ঘড়ঘড় করে আস্তে ঘুরছে একটা পাখা। রমেন বলল, ব্যাপার কী? হঠাৎ এমন করে—

কিছু না। বাড়ি যাচ্ছি।

রমেন সন্দিগ্ধভাবে শুয়ে পড়ল। মশারির ভেতর সেন্টের কড়া গন্ধ। অদ্ভুতভাবে মনে পড়ল। কুন্তলাদের বাড়িতে একটা শিউলি গাছ আছে। এ রাতে তার ঘ্রাণ পাইনি।

ভোরে যখন বাসের জন্য রাস্তায় গেলাম, তখন রমেন আর গ্রামসেবক বেঘোরে ঘুমুচ্ছে।....